নমি নমি চরণে

শ্রী সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

প্রেম মন্দির আশ্রম
রিষড়া, হুগলী

প্রকাশক ঃ
শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত
প্রেম প্রবাহ প্রকাশন, প্রেম মন্দির,
রিষড়া - ৭১২ ২৪৮

প্রথম প্রকাশ ঃ
মহাসপ্তমী, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

মূদ্রক ঃ
'লিঙ্ক', ৩৪/ডি, জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী

উৎসর্গ

শ্রীগুরু শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

'নমি চিতকমলদলে
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে।'

ভূমিকা

নানা বর্ণের ও গন্ধের ফুল দিয়ে গাঁথা মালাকে বলে বৈজয়ন্তী মালা। শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এই মালা। এখানে নানা ভাবের নানা রসের প্রবন্ধাদি দিয়ে তেমনই একখানি সুন্দর মালা গাঁথা হয়েছে, নাম তার 'নমি নমি চরণে'। পুষ্পগুলি চয়ন করে মালাটি গেঁথেছেন নিপুণ শিল্পী শ্রী সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়। আর মালাটিকে ভগবানের চরণে অর্পণ করে নমস্কার করেছেন আর এক রসিকজন শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত।

সার্থক নাম 'নমি নমি চরণে'। কারণ, প্রবন্ধগুলির বেশীরভাগই ধর্ম, সংস্কৃতি, ভগবান ও ভক্তদের নিয়ে রচিত। তাই সেগুলি শ্রীভগবানের চরণে অর্পিত হওয়ারই যোগ্য। গ্রন্থের লেখাগুলি পূর্বে প্রেম মন্দির আশ্রমের পত্রিকা 'প্রেম প্রবাহ'তে এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রশংসিত। কিছু অপ্রকাশিত লেখাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি সরস, সাবলীল, তথ্যপূর্ণ এবং গবেষণামূলক। রসগ্রাহী পাঠকের কাছে এক অমূল্য সম্পদ এই গ্রন্থখানি।

শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় একটি সুপরিচিত নাম চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক এবং রসিক নাট্যকার হিসেবে। আবার কবিতার ছন্দময় আঙ্গিনায়ও রয়েছে তাঁর স্বচ্ছন্দ পাদচারণা। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন দরদী শিক্ষক, আর সাহিত্য রচনা তাঁর সাধনা। সাহিত্যের প্রতিটি অলিন্দে রয়েছে তাঁর

সহজ আনাগোনা। গুরুদেব শ্রীশ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের গভীর স্নেহ ও একান্ত সান্নিধ্য লাভে ধন্য এবং প্রেম মন্দির আশ্রমের শিষ্য সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থের একজন মর্মজ্ঞ পাঠক এবং সাধু সঙ্গলাভে বিশেষ আগ্রহী। গ্রন্থের প্রতিটি লেখার মধ্যে এই মানসিকতার প্রতিফলন রয়েছে।

শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত বাণিজ্য বিভাগের প্রবীন শিক্ষক হলেও বর্ত্তমানে একজন দক্ষ ধর্মবক্তা এবং প্রেম প্রবাহ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তিনি শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের একজন গুণগ্রাহী সহকর্মী। গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি একজন প্রকৃত সুহৃদের কাজই করেছেন।

লেখক ও প্রকাশকের ওপর শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা জানাই। আশা করি, 'নমি নমি চরণে' গ্রন্থটি সুধী সমাজে সমাদৃত হবে এবং লেখকের শ্রম হবে সার্থক।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মধুর তোমার শেষ যে না পাই

'শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ।।
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী।।

---- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকালে, তাঁর সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলে নিঃশব্দে ভেঙে পড়তে চায় 'এ আমির আবরণ', নত হয়ে আসে উদ্ধত মস্তক, শিউরে উঠতে হয় নিজের সর্ব অঙ্গ মাখা মলিনতা দেখে। এখনও তাঁর এক একটি বাণী ও উপদেশ নাস্তিককেও ভাবায়, রুক্ষ শুষ্ক মরুজীবনে অমৃতবারি সিঞ্চন করে, অন্ধকারে পথ হাতড়ানো হতাশ মানুষকে দেয় অমল আলোর দীপ্তি। এখনও তিনি নিত্য স্মরণীয়, নিত্য পূজ্য।

ভারী সুন্দর বলতেন তিনি -- 'চাঁদ মামা সকলের মামা'। তিনিও তাই। তিনি সকলের। তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের অভ্রান্ত পথ পরিচায়ক, আবার সংসারী মানুষের পথ প্রদর্শক। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অখ্যাত পল্লীগ্রামের এই প্রায় নিরক্ষর মানুষটিকে অবতারকল্প মহাপুরুষ হিসাবে শ্রদ্ধা জানায়। কত অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তিনি। ভক্তদের বলতেন, 'আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টানরাও পাবে। ..... আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের মিথ্যা -- এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়।' ধর্ম নিয়ে এখনও রক্ত ঝরে, সাম্প্রদায়িকতা আজও আমাদের দেশে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো জাঁকিয়ে বসে আছে। জাতিভেদও আমাদের দেশের কলঙ্ক। 'জাতিভেদ?' ঠাকুর বলছেন, 'কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নেই। চণ্ডালের ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না।' ধর্ম নিয়ে হানাহানি আর রক্তপাত সহজেই বন্ধ হয়, যদি আমরা

শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুধাবন করি, তাঁর পবিত্র চরণ ছুঁয়ে দাঁড়াই, তাঁর মত ও পথের পথিক হই।

তীর্থে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। ভক্তজন উজাড় করে দেয় তাদের ভক্তির অর্ঘ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সচল তীর্থ। তাঁর চরণতলে, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় একটু আশ্রয়ের জন্যে দু'দণ্ড শান্তির প্রত্যাশায় প্রতিদিন নানা ধরণের মানুষ আসত। এদের অধিকাংশই সংসারী। সংসার করছে বলে কি তারা অপরাধী? ঠাকুর বলতেন -- 'তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে।' বার বার তিনি বলতেন যে সংসারী মানুষের ভূমিকা হবে ধনী বাড়ির দাসীর মতো। দাসী বাবুর বাড়ীকে বলে 'আমার বাড়ি', বাবুর ছেলেমেয়েদের বলে 'আমার ছেলেমেয়ে'। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দেশে, তার নিজের বাড়ি, নিজের ছেলেমেয়ের দিকে। তিনি বলতেন যে সংসারে অনাসক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। ঈশ্বরানুরাগের অঞ্জনটুকু যেন নয়নে লেগে থাকে। 'কাকে সবচেয়ে ভালবাসো গো?' ঠাকুরের সহাস্য প্রশ্নে এক মহিলার উত্তর, 'আমার এক ছোট্ট ভাইপোকে।' ঠাকুর বললেন, 'গোপাল জ্ঞানে তার সেবা কর।' কি চমৎকার পথ নির্দেশ। পিতামাতাকেও ঈশ্বর ঈশ্বরী রূপে দেখতে বলতেন তিনি।

সংসারী মানুষকে ঠাকুর মাঝে মাঝে নির্জনবাস করে সাধনা করতে বলতেন। অপূর্ব উপমা দিয়ে বোঝাতেন -- 'দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন তোলা হলো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না -- সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।' হয় নির্জন বাস, নয় সাধুসঙ্গ। দুটির একটিকে বেছে নেবে সাধারণ সংসারী মানুষ।

সংসারী মানুষের কি কর্তব্য? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ -- গৃহকর্তা সন্তানাদি মানুষ করবে। স্ত্রীকে ধর্মোপদেশ দেবে, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের ভার নেবে। এমন কি ভবিষ্যতের সংস্থানও গৃহীকে করে যেতে হবে। তিনি বলতেন, 'তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় করে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়।' একবার নাট্যকার অভিনেতা গিরিশ ঘোষ এসে খবর দিলেন যে দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন। শুনে তো ঠাকুর অবাক! 'সে কি! পরিবারের খাওয়া দাওয়া কিভাবে হবে? কি করে তাদের চলবে?' একবার গেছেন কেশব সেনের বাড়ি। অনেক লোক এসেছে। মেয়েরা বসেছে চিকের ভেতর। উদাত্ত কণ্ঠে কেশব সেন প্রার্থনা করছেন -- 'হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর যেন আমরা ভক্তি সাগরে ডুবে যাই।' রসিক প্রবর শ্রীরামকৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন -- 'ভক্তি সাগরে যদি ডুবে যাবে তবে চিকের

ভেতর যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের দশা কি হবে?' ঠাকুরের রসবোধে আমরা না হেসে পারি না। তিনি কিন্তু এই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন, স্ত্রী পুত্র কন্যাদের দেখাশোনা করা গৃহীর প্রাথমিক কর্তব্য। তাদের পথে বসিয়ে, সংসার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলে ধার্মিক হওয়া যায় না। সংসারে থেকেই ধর্মজীবন যাপন করতে হবে। তবে, সংসার করতে হবে অনাসক্তভাবে। 'সংসার কর্মভূমি,' ঠাকুরের মন্তব্য, 'এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক। সেই গল্পের কথা মনে পড়ে? তোতাপুরীর মুখে শোনা ঐ গল্পটি প্রায়ই তিনি ভক্তদের শোনাতেন। শিশু বাঘের জন্ম দিয়ে বাঘিনী মারা যেতে শিশু বাঘ ছাগলের পালে বড় হতে লাগল। ছাগলের মতোই সে ঘাস খায় আর ব্যা ব্যা করে ডাকে। এসব ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেল অরণ্যের বাঘ। সে ভাবল তারই এক স্বজাতি ঘাস খায় আর ব্যা ব্যা করে ডাকে! ছাগলের পালে বড় হওয়া বাঘকে সে নিয়ে গেল এক জলাশয়ের ধারে। জলের মধ্যে দেখালো তার প্রতিবিম্ব, খেতে দিল মাংসের টুকরো, নিয়ে গেল তার স্বস্থান অরণ্যের গভীরে, চিনিয়ে দিল তার স্বরূপকে। ছোট্ট একটি গল্পের বিন্দুতে ঠাকুর এনে দেন মহাসিন্ধুর ব্যাপ্তি। অমৃতের পুত্র হয়েও আমরা অনেকেই পশুর মতো জীবনযাপন করছি। গুরুই চিনিয়ে দেন স্বরূপ, নিয়ে যান বাঞ্ছিত স্থানে। পথভ্রষ্ট, নিশানা হারানো মানুষকে এভাবেই ঠাকুর পথ সন্ধান দিয়েছেন। দুরূহ শাস্ত্রকথা, ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব এমন সহজ সরল ভাষায় আর কার শ্রীমুখ থেকে এমনভাবে উচ্চারিত হয়েছে?'

ঈশ্বর দর্শন কি সম্ভব? এই জটিল প্রশ্নের কী সরল সমাধান! 'ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদে?' চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে হবে মনের ময়লা। তবে 'ঈশ্বররূপ চুম্বকপাথর মনরূপ ছুঁচকে' টেনে নেবে। কিন্তু যাঁর মনে বিষয়বুদ্ধি রয়েছে, তাঁর পক্ষে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব নয়। বিষয়াসক্ত মনকে তিনি বলেছেন 'ভিজে দেশলাই কাঠি, হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না।' সুগভীর জ্ঞান আর পাণ্ডিত্য থাকলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে? শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর -- 'হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে। শুধু পণ্ডিত, বিবেক-বৈরাগ্য নেই -- তার কামিনী-কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।' কিন্তু ঈশ্বর যদি স্বয়ং কৃপা করেন? তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের ওপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়; অর মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের দিকে ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

ভক্তকেও অহংমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল প্রাথনা করতে হয়। 'ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।'

এতবড় একজন অবতারকল্প মহাপুরুষ, অথচ ভক্তসঙ্গে কত না রস রসিকতা করতেন। নিজেই বলতেন যে তিনি শুকনো সন্ন্যাসী হতে চাননা, রসে বশে থাকতে চান। তাই তাঁর শাস্ত্র-উপদেশও হয়ে উঠত রসাল। ঈশ্বর দর্শনের জন্যে ব্যাকুলতা চাই, কিন্তু সময় না হলে কিছু হবে না -- একথা বোঝাতে সুরসিক ঠাকুর বলছেন -- 'একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল -- মা, আমার যখন হাগা পাবে আমাকে উঠিয়ে দিও। মা বললেন, বাবা, হাগাই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।' গ্রাম্য ভাষায় সরস ভঙ্গীতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে তাঁর জুড়ি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ দীনদয়াল। গিরিশ ঘোষকে একদিন বললেন -- 'আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না। তারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে। ওদের ধন যেন রক্তপূঁজ।' এ সর্বত্যাগী এক মহাসাধকের কথা? না কোনও সমাজতন্ত্রীর অকাট্য মন্তব্য?

আমাদের শাস্ত্রে অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। ঠাকুরের অতিথি সেবা অতুলনীয়। ছোট্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ঠাকুর তখন গুরুতর অসুস্থ, দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই। বৈশাখ মাস, অসহ্য গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ এসেছেন। তাঁকে জলখাবার দেবার জন্য ঠাকুরের সে কি ব্যাকুলতা! গরম কচুরি, লুচি আর মিষ্টান্ন আনা হল। মাতৃস্নেহে সেই খাবার সাজিয়ে গিরিশের হাতে দিলেন তিনি, বললেন, 'খেয়ে নাও।' তারপর ঐ অসুস্থ শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামলেন। খসে পড়ল পরনের বস্ত্র, হুঁশ নেই। একটু দূরে রয়েছে কুঁজো। ঐ কুঁজোর জল ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মের ঝলসানো সন্ধ্যায় ভক্ত অতিথিকে তিনি নিজের হাতে ঠাণ্ডা জল খাওয়াবেন। কুঁজো থেকে জল নিয়ে মন্থর গতিতে তিনি গিরিশের দিকে গিয়ে গেলেন, তাঁর হাতে তুলে দিলেন জলের গেলাস।

কুঁজোর জল সেদিন ঠাণ্ডা ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের যত্নে, আন্তরিকতায়, ভালোবাসায় ঐ জল সেদিন অমৃত হয়ে উঠেছিল। কে বলে শ্রীরামকৃষ্ণের কেবল বালক ভাব? কখনও তিনি অবোধ বালক, কখনও পরম প্রাজ্ঞ শাস্ত্রবেত্তা, কখনও রসরাজ। কখনও বা স্নেহময়ী মা -- যে মা সন্তানের দুঃখ ও অদর্শনে কাঁদেন, অভুক্ত অতিথিদের সেবার জন্যে ব্যাকুল হন।

আর সকলের ভালোবাসায় ফাঁক আর ফাঁকি থাকে। নিঃস্বার্থ এবং অহৈতুকী ভালোবাসা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের। গাজীপুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন -- 'রামকৃষ্ণের জুড়ি নাই। সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহৈতুকী দয়া, সে ইনটেন্স সিমপ্যাথী বদ্ধ জীবনের জন্য -- এ জগতে আর নাই। এত ভালবাসা আমার পিতামাতায়

কখনও বাসে নাই।' ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা গেলেন তিরিশ বছরের অধর। ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন তাঁকে। মৃত্যু সংবাদ শুনে মায়ের মন্দিরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতে লাগলেন -- 'মাগো, আমার কেন এত যন্ত্রণা! আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো আমাকে এত সইতে হচ্ছে!'

দ্রুত বদলে যাচ্ছে সমাজ। হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা আর স্বার্থপরতায় উন্মত্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী। কে আমাদের অঙ্গারশয্যায় বিছিয়ে দেবে শীতল পদ্মপাতা? রোগে-শোকে-ব্যর্থতায়-অপমানে কে দেবেন দু'দণ্ড শান্তি? অন্ধকার পিচ্ছিল পথে পড়ে যাওয়া অসহায় মানুষ আর কার উদ্দেশে বাড়িয়ে দেবে দুটি বাহু? উত্তর একটাই -- শ্রীরামকৃষ্ণ। 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পবিত্র করুণাধারা — পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী।
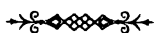
শ্রীচরণেষু মাস্টারমশাই

শ্রীচরণেষু মাস্টারমশাই,

পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় আপনি আমাকে আপনার অমরকন্টক যাত্রার সঙ্গী হতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে চিকিৎসকের নির্দেশে আমি এখন শয্যাবন্দী। কি করে আপনার ভ্রমণসঙ্গী হই?

মাস্টারমশাই, বিছানায় শুয়ে থাকলেও আমার মন কিন্তু আপনাকে অনুসরণ করবে। মুম্বাই মেলে অদৃশ্য ভাবে আমি আপনার পাশটিতে থাকব। বিলাসপুরে আপনার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে আপনার সঙ্গে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে পেনড্রা রোড যাব। হোটেলে রাত কাটিয়ে বাসে আপনার পাশে বসে অতিক্রম করব বেয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ। প্রথমে সমতলভূমির ওপর দিয়ে বাসের স্মার্টলি ছুটে চলা, তারপর সাবধানী ভঙ্গীতে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ভাঙতে ভাঙতে বাসের ক্রম উত্তরণ — আপনাকে নিশ্চয় মুগ্ধ করবে। আবহাওয়ার চরিত্র হঠাৎ বদলে যাবে। আমি ফিসফিস করে আপনাকে বলব — 'মাস্টারমশাই, শালটা জড়িয়ে নিন।' আপনার হাতের কাছেই ব্যাগ। আপনি শাল বের করে গায়ে জড়িয়ে নেবেন। আপনি প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য দেখে অভিভূত হবেন, আর অতলস্পর্শী খাদ দেখে শিউরে উঠবেন। একসময় বাসযাত্রীদের কথাবার্তা থেমে যাবে। সুন্দরের রাজ্যে সবাই অভিসার করছে, বৃথা বাক্যব্যয় এখানে অশোভন।

বাস্ থামবে বিস্তৃত সমতলভূমিতে। মন্থর পদক্ষেপে আপনি এগিয়ে যাবেন। নর্মদা মন্দির এখান থেকে প্রায় দেড় কি মি দূরে। আপনি মন্দিরের কাছেই এক ধর্মশালায় আশ্রয় নেবেন। মনে করবেন আপনার সঙ্গে আমিও আছি।

মাস্টারমশাই, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন নর্মদা মন্দিরের সুদৃশ্য প্রবেশদ্বারের সামনে। আপনি সবকিছু খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখছেন। প্রাচীরবেষ্টিত পবিত্র মন্দিরটিকে আপনার মনে হবে ঘনীভূত ভক্তি ও পবিত্রতা। আপনি প্রবেশদ্বার ও ভেতরের চত্বর দেখে পুলকিত হবেন। কি সুন্দর পরিবেশ! আপনার চোখে পড়বে বাঁধানো দুটি পবিত্র

কুণ্ড আর বিভিন্ন দেবদেবীর ছোট ছোট মন্দির। বড় কুণ্ডটির নাম মার্কণ্ডেয় কুণ্ড আর অন্যটি? যে পবিত্র নদীর উৎস দেখতে আপনার আগমন, সেই নর্মদা কুণ্ড। আপনি এবার তাকাবেন কুণ্ড সংলগ্ন জোড়া মন্দিরের দিকে — একটি মন্দির নর্মদা মাতার, অন্যটি নর্মদেশ্বর মহাদেবের। মন্দিরের সামনে একটি অভিনব মূর্তি দেখে আপনি ভাববেন এটা আবার কি। মূর্তিটি হল — পাথরের ছোট হাতীর ওপর উপবিষ্ট মুণ্ডহীন আরোহীর। ঐ মূর্তি দেখে কিন্তু আপনি বিস্মিত হবেন না। আপনার বিস্ময় জাগবে অন্য দৃশ্য দেখে। আপনি দেখবেন বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা মাটিতে শুয়ে হাতীর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাবার বিচিত্র প্রয়াসে ব্যস্ত। ব্যাপার আর কিছুই নয়। প্রচলিত বিশ্বাস — পাপীরা নয়, পুণ্যবাণরাই এর মধ্যে দিয়ে গলে যেতে পারে। মাস্টারমশাই, আপনি কি ঐ পাপপুণ্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন?

মাস্টারমশাই, আপনি এবার আপনার কাঙ্ক্ষিত নর্মদা কুণ্ডটা চাক্ষুষ করবেন। ঐ কুণ্ড থেকেই নর্মদা নদীর সুদীর্ঘ যাত্রাপথ শুরু। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, নর্মদার প্রকৃত উদ্গম অমরকন্টক থেকে দু কিমি দূরে — মায়ী কী বাগিয়া বা মায়ের বাগান। যা হোক, বড় পবিত্র, বড় ঐতিহ্যমণ্ডিত, বড় হৃদয়স্পর্শী ঐ কুন্ড। আপনি নতমস্তকে করজোড়ে ফিসফিস করে বলবেন — 'নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রতেজাৎ বিনিঃসৃতা।/তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরানি চরানি চ।।' অর্থাৎ নদীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেন নর্মদা যাঁর সৃষ্টি রুদ্রের তেজ থেকে। স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই তিনি ত্রাণ করেন। মাস্টারমশাই, আপনার কি সেই প্রচলিত লোককথাটি মনে পড়বে? 'নর্মদা শিবের কন্যা। শোন -এর সঙ্গে তার বিয়ের ঠিকঠাক। নর্মদার সাজসজ্জার ভার যার ওপরে, সেই নাপিতকন্যা মুগ্ধ হল শোনের পৌরুষে। নর্মদার রূপ ধরে সে হাজির হল বিয়ের মণ্ডপে। খবর এলো নর্মদার কাছে। মানিনী নর্মদা ঘুরে রইল পশ্চিমে। কপিলমুনি আটকাতে চাইলেন। নর্মদা বাধা মানল না। পাথরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটে গেল ভারতের পশ্চিম তটে। যেখানে কপিল বাধা দিলেন, সেখানে কপিলধারা প্রপাত। নর্মদার আছড়ে পড়া আজও বাধাহীন। সে আজও চিরকুমারী। বিয়ে ভেঙে গেল। শোন রইল চিরকুমার, বয়ে গেল উত্তরের পথে (পকেট ভ্রমণ - স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী)।

মাস্টারমশাই, প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীও আপনার অজানা নয়। পুরাণের ধূসর অতীত আপনার সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আপনি কবি মানুষ। আপনি কল্পনানেত্রে দেখবেন — দেবাদিদেব মহাদেব অমরকন্টকের চূড়ায় ধ্যানস্থ। অকস্মাৎ তাঁর নীলকণ্ঠ থেকে আবির্ভূতা হলেন এক নারী। আবির্ভূতা হয়েই তিনি মহাদেবের দক্ষিণ চরণের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরই তপস্যায় মগ্ন হয়ে রইলেন। এইভাবে অতিবাহিত হল অনন্তকাল। একসময় শিবের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি ঐ অনিন্দ্যকান্তি কন্যার রূপলাবন্য দেখে মুগ্ধ হলেন। জটাধারিণী ঐ নারীর ডান হাতের আঙুলে অক্ষমালা, বাঁ হাতে

কমণ্ডলু, যেন জ্যোতির্ময়ী যোগিনী মূর্তি। শিব তাঁকে বর দিতে চাইলে তপস্বিনী বললেন যে তিনি মহাদেবের সঙ্গে শাশ্বতকাল নিত্যযুক্তা হয়ে থাকতে চান। দেবাদিদেব ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললেন -- তুমি হবে ' মহামোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কাং'।

অমরকন্টক পর্বতে আবার তপস্যায় ব্রতী হলেন ঐ নারী। স্বর্গের দেবতারা তাঁকে দেখতে এলেন। এলেন, দেখলেন এবং মোহিত হলেন। কিন্তু জয় করতে পারলেন না। তাঁরা ঐ নারীকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। তবু ধরা দিলেন না তেজস্বিনী যোগিনী। ব্যর্থ হয়ে দেবতাদের জেদ বেড়ে গেল। তাঁরা শক্তি'র সাহায্যে ঐ নারীকে লাভ করতে চাইলেন। তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তাপসী নদী রূপ ধারণ করলেন। দেবতাদের কাছে তিনি অপ্রাপনীয়া হয়ে রইলেন।

সর্বজ্ঞ শিব ধ্যানযোগে সবকিছু জেনেছিলেন। তিনি ঐ তাপসীর কাছে এসে বললেন -- তুমি হও আমার আনন্দ বিলাসের ক্ষেত্র। আজ থেকে তোমার নাম হল নর্মদা। তুমি 'জলময়ী শিবা', আমি তোমার জলে শিবলিঙ্গরূপে চিরকাল ভেসে বেড়াব।

মাস্টারমশাই, ধূসর পুরাণের রাজ্য থেকে আপনি এবার নেমে আসবেন বর্তমানের অমরকন্টকে। আপনি এবার দেখবেন গোমুখ নালা। যার মধ্যে দিয়ে নর্মদা এসে পড়েছে কোটিতীর্থে। কোটিতীর্থের ধর্মীয় তাৎপর্য অপরিসীম। যাঁরা দুরূহ নর্মদা পরিক্রমা করবেন, তাঁদের আসতেই হবে এই তীর্থে। এর জলেই তাঁদের সংকল্প করতে হবে। পরম পবিত্র এই জল। আপনি হয়ত মনে মনে 'জয় মা নর্মদে' বলে ঐ জল স্পর্শ করবেন। আপনি সাবিত্রী কুণ্ড ও গায়ত্রী কুণ্ড দুটি দেখতে ভুলবেন না যেন।

মাস্টারমশাই, নর্মদা মন্দির চত্বর এবার আপনি পেরিয়ে গিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন পাতালেশ্বর শিবমন্দির দেখবেন। সিঁড়ি দিয়ে আপনি ধীর পদক্ষেপে কিছুটা নীচে নামবেন। দেখবেন এক গহ্বরের মধ্যে মহাদেবের মূর্তি স্বমহিমায় বিরাজমান। নর্মদা কুণ্ডের সঙ্গে এই গহ্বরের যোগাযোগ থাকায় স্থানটি প্রায়ই জলময় হয়ে যায়। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি চোখ বুজে নিঃশব্দে শিব বন্দনা করছেন।

মাস্টারমশাই, এবার আপনাকে একটা অটো বা টাঙা ভাড়া করে ঘুরতে হবে। আপনি একে একে দেখবেন মায়ী কী বাগিয়া বা মায়ের বাগান, শোন মুড়া, কবীর চবুতরা, কপিলধারা, দুগ্ধধারা প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। শোন নদীর উদ্‌গম কেন্দ্র শোনমুড়া যেন প্রাণচঞ্চল হনুমানের অবাধ বিচরণভূমি। মাস্টারমশাই, ভয় পাবেন না। ওরা আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। আপনি দেখবেন কঠিন পাহাড়ের বুক চিরে ঝরে যাচ্ছে ক্ষীণ জলধারা যা জমা হচ্ছে এক বাঁধানো চৌবাচ্ছায়। এটাই হল শোন নদীর উৎস। এরপর 'মায়ী কী বাগিয়া'। এখানকার কোনো সাধুর সঙ্গে হয়তো আপনি গল্পগুজব করবেন। তিনি স্থান মাহাত্ম্য সম্পর্কে হয়তো অনেক কথা আপনাকে

জানাবেন। আপনি গুলবকাওলী ফুলের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন, কেননা ঐ ফুল থেকে চোখের রোগের ওষুধ তৈরী হয়।

মাস্টারমশাই, এবারে আপনাকে অতিক্রম করতে হবে প্রায় সাত কিমি পথ। আপনার গন্তব্যস্থল কপিলধারা। এটি একটি অপূর্ব জলপ্রপাত। আপনি কথা খুঁজে পাবেন না, নীরবে দাঁড়িয়ে আপনি শুনে যাবেন প্রপাতের অবিশ্রাম গর্জন। পাশেই রয়েছে কপিল মুনির নামাঙ্কিত আশ্রম। এরপর এক কিমি বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে আপনাকে দর্শন করতে হবে পাহাড় অরণ্য জলপ্রপাত পরিবেষ্টিত একটি অপূর্ব স্থান - - দুগ্ধধারা। বড় বড় পাথরের নিষেধ অগ্রাহ্য করতে করতে নর্মদার দুধের মতো সাদা জল ছুটে চলেছে। এখানে একটি গুহা আছে। শোনা যায় মহর্ষি দুর্বাসা ওখানে তপস্যা করেছিলেন।

মাস্টারমশাই, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ঘুরলাম। এবার আপনাকে রেখে আমি বিদায় নেব। আপনার কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আপনি দারুণ খুশী। ওঁরা আপনাকে যেতে দেবেন না। আপনি এখন ওঁদের বাহুপাশে বন্দী। মানস পরিভ্রমণ শেষে আমিও ফিরে এসেছি আমার ঘরে।

আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ইতি।

আলোর পানে প্রাণের চলা

আজকে নয়, সে আজকে নয়। সে ডাক যে অনেক দিনের। সে ডাক শুনেছি সোনা রোদঝরা প্রভাতে। কিন্তু অধীর হইনি। যৌবনে হাসি-গান-আনন্দে যখন মত্ত, শুনেছি তখনও। কিন্তু প্রবেশ করেনি মরমে। দুঃখ বিরহ নিরানন্দে যখন কাতর, শুনেছি সে সময়েও।কিন্তু উৎকর্ণ হয়নি। জীবন থেকে সোনার আলো আজ অপহৃত, ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে অপরাহ্ণের ম্লানিমা। আজও আমি শুনে যাচ্ছি সেই বংশীধ্বনি, সেই আশ্চর্য অমোঘ মন্ত্র 'চরৈবেতি চরৈবেতি'। আমার তনু মন প্রাণ এখন মৌসুমী সমুদ্র। আমি যাবো, এবার যেতেই হবে আমাকে। যাবার বেলায় স্মৃতি যেন পিছু না ডাকে। নদী যেন আমার ক্লান্ত চরণে পরিয়ে না দেয় তার অকারণ অবারণ চলার নূপুর।

'যাবার সময় হল বিহঙ্গের'। বাঁশী বেজেই চলেছে — সীমা থেকে অসীমে উত্তরণের সুর লহরী। যাবার সময় পাথেয় নেব না কিছুই। অনেক দিনের সযত্ন সঞ্চিত তুচ্ছ বস্তু রুদ্ধ ঘরের অন্ধকার কোনে পড়ে থাকবে — কয়েকটি কড়ি, কিছু কামনা বাসনা কীট, কিছু সাধ আর স্বপ্ন। সঞ্চয় নয়, আবর্জনা। সার নয়, অসার।

গৃহবন্দি ছিলাম বহুদিন, তাই বুঝিনি চলার মাধুর্য। অচলায়তনে বদ্ধ ছিলাম দীর্ঘকাল, তাই খুঁজিনি আলোর ঠিকানা, অসীম নীল আকাশের হাতছানি। সঞ্চয়ী ছিলাম বহুযুগ, তাই উপলব্ধি করিনি রিক্ততার আনন্দ, ত্যাগের মাধুর্য। জীবন বাসরের বাসি ফুলের মালা দুপায়ে দলিত মথিত করে আমি যাত্রা করবো। ফাল্গুনের গানে, যৌবনের মধুবনে আর ফিরে যেতে চাইবে না আমার ক্লান্ত প্রাণ। বাসনার অরণ্যে আর নীড় খুঁজে নেবে না আমার অতৃপ্ত মন। রিক্ত হাতে, শূন্য হৃদয়ে পরাণ সখার অন্বেষণে আমার এই নীরব অভিসার।

সবারই শেষ আছে — অশেষ কেবল আলোর পানে প্রাণের চলা। ফিকে হতে হতে বিবর্ণ হয়ে যায় ভালোলাগা - রামধনু। রূপ-রঙ-রস অটুট থাকে কেবল নিবাত নিষ্কম্প প্রত্যয় শিখার — 'অন্ধকার থেকে আমায় নিয়ে চলো আলোয়, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে — এক আনন্দময় রূপান্তরের দিকে।

কিন্তু চলতে চলতে এক সময়ে আমাকে থামতেই হবে। রাতের আকাশে জ্বলবে হাজার তারার জোনাকি। আমি শুধু খুঁজে নেব একটিকে। তার নাম স্বাতী নক্ষত্র। আকাশের কোলে খেলবে হাজার মেঘের শিশু। আমি শুধু বেছে নেব একটিকে। তার নাম জলদ মেঘ। কুলহীন সমুদ্র থেকে ভেসে উঠবে শুক্তি, অন্তরে তার নীরব আর্তি -- শুধু দাও একবিন্দু বৃষ্টির জল। জলের ওপর ভাসমান, তবু চাই একটি স্বচ্ছ নিটোল বৃষ্টিবিন্দু যা গ্রহণ করে শুক্তি তলিয়ে যাবে সমুদ্রের স্তব্ধ অতল নিস্তরঙ্গ গর্ভে। মুক্তো তৈরীর কঠোর সাধনায় হবে একাগ্রচিত্ত।

স্বাতী নক্ষত্র -- অমোঘ নির্দেশ। বৃষ্টিবিন্দু পরমতমের অমৃতবাণী। সমুদ্র -- কোলাহলের হলাহলের পৃথিবী। শুক্তি -- আমার ব্যাকুল মন, তৃষিত হৃদয়। মুক্তো -- সব পেয়েছির দেশের চাবিকাঠি।

কিন্তু কোথায় স্বাতী নক্ষত্র? বৃষ্টিগর্ভ সজল কালো জলদ মেঘ? উত্তর শুনি প্রাণের গভীরে, মনের গহনে -- এগিয়ে চলো, চলো। .... যে চলে দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে, তার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তারপর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্তপথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে। .... অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।'

অকাজের বোঝা নামিয়ে রেখে এবার আমায় এগিয়ে যেতে হবে। যে বাঁশীর সুর শুনেছি, অন্তর থেকে যে নির্দেশ পেয়েছি তা আমার অচলায়তনকে ভেঙে দিচ্ছে। এবার তাই আলোর পানে শুরু হোক প্রাণের চলা।

মহাশিল্পীর তুলিতে পৌরাণিক জগৎ

মহা শিল্পী নন্দলাল বসুকে আশীর্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন —

'চিরসুন্দরে কর গো তোমার
রেখা বন্ধনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক তব তুলি
চিররস-নিষ্যন্দী!'

রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন তাই-ই হয়েছিলেন নন্দলাল। তাঁর তুলিতে চিরসুন্দরেরই অপরূপ রূপ উদ্‌ঘাটিত। মহাদেবের জটার মতোই তাঁর তুলি হয়েছিল চিররস-নিষ্যন্দী। বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পজগতে আচার্য নন্দলাল বসু অনন্য স্বকীয়তায় ভাস্বর। ১৮৮৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর খড়গপুরে যে শিশুটি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন, পরবর্তীকালে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি সর্বত্র বন্দিত হন। ছাত্র জীবনেই এই শিল্প প্রতিভার উন্মেষ, পরে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং বনস্পতি প্রতিম কবিগুরুর স্নেহছায়ায় শান্তিনিকেতনে এই প্রতিভার সার্বিক বিকাশ। বীজের মহীরুহে রূপান্তর। আর এই রং তুলির 'ইন্দ্রজাল ইন্দ্র ধনুচ্ছটা'র অন্যতম প্রধান নেপথ্য শক্তি ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব।

ভারতের সনাতন ধর্মগ্রন্থগুলি শিল্পসাহিত্যের এক মহাসমুদ্র। ধর্ম সাধকরা এই চিরকালের গ্রন্থ থেকে পেয়েছেন অভ্রান্ত পথনির্দেশ, কবিশিল্পীরা এই পবিত্র সাগরে অবগাহন করে লাভ করেছেন বিস্ময়কর রস সম্পদ। নন্দলালের যখন যৌবনোন্মেষ, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃতলোকে। কিন্তু ঐ অবতারকল্প মহাপুরুষের চিন্তাধারা সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তখনও মহান কর্মযোগে আর মানুষ গড়ার অঙ্গীকারে নিবেদিতপ্রাণ। ১৯০২ সালে স্বামিজীর মহাপ্রয়াণের পর ঐ বীর সন্ন্যাসীর পথনির্দেশ ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মধারা 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' ভারতীয় জনগণকে আত্মানুসন্ধানের পথ দেখাল। তরুণ নন্দলাল এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় শাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ নয়, স্বদেশের মধ্যেই রয়েছে শিল্প সৃষ্টির অজস্র উপকরণ। দেশের সহজ-সরল সাধারণ

মানুষ, নিসর্গ প্রকৃতি আর পুরাণের দেবদেবী ও ঘটনাবলী পরাধীন দেশের আত্মবিস্মৃত মানুষের কাছে রং তুলির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করারই আর এক নাম দেশপ্রেম। শিল্পীকে এই কাজে যাঁরা সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ আর লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতার কাছে ভারত ছিল 'দ্বিতীয় স্বদেশ'। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মতো শিল্পবোদ্ধা বিরল। নন্দলাল যখন সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র, তখন একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিবেদিতা এলেন স্কুল দেখতে। নন্দলাল তখন দুটি ছবি আঁকছিলেন। একটি মা কালীর, অন্যটি সত্যভামার মানভঞ্জন। নন্দলাল লেখেন -- "নিবেদিতা কালীর ছবিখানা দেখে বলেছিলেন, 'আরো একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশী থাকবে না, আর একটু উন্মাদিনী ভাবের হবে।" নিবেদিতার অনুরোধে নন্দলাল স্বামীজিরও ছবি আঁকেন (সে ছবি কোথায়?)। নিবেদিতা প্রশংসা করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাতে ভুললেন না -- 'ছবিতে কাপড় চোপড় একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।' আর একবার তিনি নন্দলালের একটি পৌরাণিক চিত্রের ভুল ধরে শিল্পীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকছিলেন নন্দলাল। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, -- 'কার ছবি আঁকছো?' নন্দলালের উত্তর -- 'কেন রাধাকৃষ্ণের!' নিবেদিতা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন ঐ চিত্রে ঢলঢল যৌবনরস টলমল করছে -- যেন পার্থিব কোনো নায়ক-নায়িকার ছবি। ঐ ছবিতে কোথায় সেই স্বর্গীয় সুষমা, অপার্থিব মহিমা আর দিব্য আভা? একটু হেসে বললেন -- 'পঞ্চাশ না পেরিয়ে আর রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকবেন না।' যৌবনের রক্তরাগ যখন ফিকে হয়ে যাবে, থিতিয়ে যাবে বাসনা কামনার ঘোলা জল -- তখনই রাধাকৃষ্ণের চিত্রাংকণে আসবে অপার্থিব জ্যোতি -- অধরা সৌন্দর্য্য -- অনুপম কান্তি। নন্দলাল নিবেদিতার উপদেশ উপেক্ষা করেন নি।

নন্দলালের যে সমস্ত পৌরাণিক চিত্র অমরতা লাভ করেছে, সেগুলি হল -- কৈকেয়ী ও মন্থরা, অহল্যার পাষাণমুক্তি, শিবের ধ্বংসনৃত্য, শিবের বিষপান, পার্বতীর শোক, বর্ষফল কখন, মদনভস্মের চিত্র, উমা-মহেশ্বর, জতুগৃহ দাহ, শিবসতীর অংশ, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান, পাণ্ডব বিষাদ, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন, কৃষ্ণ সুদামা, কৈকেয়ী, সাবিত্রী-যম, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারী, যম-নচিকেতা, বাউল, একলব্যের গুরুদক্ষিণা, অন্নপূর্ণা, কাশীর ঘাট প্রভৃতি। কোনো কোনো কলা-সমালোচকের মতে শিবলীলার চিত্রায়ণই নন্দলালের সবচেয়ে সার্থক সৃষ্টি। অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন -- "শৈবপুরাণের চিত্রায়ণে নন্দলাল যে অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।.... তাঁহার শিব চরিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য -- 'শিবের ধ্বংস নৃত্য,' 'পার্বতীর শোক'। পার্বতীকে ক্রোড়ে করিয়া শিবের যুগযুগ ব্যাপী

ধ্যানে মগ্ন শোকের চিত্র -- শিবের এই মুখের কল্পনা নন্দলালের উচ্চ চিন্তার শ্রেষ্ঠ পথ। শিবচিত্রে এইরূপ মহান কল্পনা ইতিপূর্বে কোনো শিল্পী সার্থক করিতে পারেন নাই।" শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পীর আর একটি চিত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ সমালোচনা করেছেন। তা হল 'কুমার সম্ভবে' বর্ণিত মদনভস্মের উপাখ্যান। মদনভস্ম ক'রে পার্বতীকে প্রত্যাখ্যান করে শিব প্রস্থান করেছেন। "শিল্পী শিবের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার দ্রুত গমনের সময় তাঁর রুদ্রাক্ষ মালার হাত হইতে পতনে।... লজ্জায় ক্ষোভে অভিমানে পার্বতী পিষ্ট পল্লবের মতো ভাঙিয়া পড়িলেন সখীর হাতের উপর। এইরূপ মর্মভেদী করুণ চিত্র বাংলার আর কোনো শিল্পী এইরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।"

শিব চিত্রাংকনে নন্দলাল আর একটি কারণে স্মরণীয়। বাংলার পটশিল্পে এবং অন্যত্র ইতিপূর্বে যে শিবমূর্তি আমরা দেখেছি তা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। তা যেন দেবাদিদেবের ব্যঙ্গচিত্র। নন্দলাল "সেই দুষ্ট পন্থা বর্জন করিয়া এক কমনীয় কান্তি, শ্মশ্রুহীন, চিরকুমার, অনন্তযৌবন অতিমানুষের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা মধ্যযুগের শিবমুর্তির কল্পনাকে নূতন মর্যাদা ও পরিণতি দান করিয়াছে" (অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়)।

মহান শিল্পী আর মহান সাধক বোধহয় সম গোত্রীয়। ধ্যানতন্ময়তা ছাড়া কি পুরাণের ধূসর চরিত্র পূর্ণ গরিমায় শিল্পীর তুলিতে নবজীবন প্রাপ্ত হয়? উদ্‌ঘাটন করা যায় পাণ্ডবদের বিষাদ খিন্ন রূপ কিংবা যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের গভীর অর্থবহ রূপরেখা? শিবসতীর অংশ চিত্রে যে অনাবশ্যক বর্ণবহুল ও আলোছায়ার লীলামাধুরী, স্বর্গীয় মহিমা ও বিরাটত্বের ব্যঞ্জনা - আত্ম সমাহিত না হলে, মনের গভীরে ভক্তির প্রসন্ন শিখাটি জ্বলে না উঠলে তা কি কোনো শিল্পীর পক্ষে আঁকা সম্ভব হতো? রূপসাগরে ডুব না দিয়ে কেউ কখনো কি পেয়েছেন অরূপ রতন?

নন্দলালের প্রতিটি পৌরাণিক চিত্র যে চিরকালের চিত্র হয়ে উঠেছে, তার মূলে কেবল ঐ মহাশিল্পীর অংকণ-নৈপুণ্য নেই -- আছে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তরিক সহমর্মিতা, অথচ গভীর সাধনা আর ধ্যান নিবিষ্টতা।

(মহান শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে লিখিত)

সুখের উৎস সন্ধানে

দীর্ঘজীবী দুঃখের একটি গর্বিত যাযাবর ভাই আছে। তার নাম সুখ। এই যাযাবর ভাইটির চাহিদা প্রচণ্ড। অনাদিকাল থেকে সকলেই তাকে চাইছে। কিন্তু সে যেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মতো সোনার রঙের দিগন্তরেখা -- ধরা দিয়েই আছে, তবু ধরা দিতে চায়না। ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সুখের দাদা দুঃখের অনাহূত উপস্থিতি এবং সুদীর্ঘকাল স্থিতি। কিন্তু সুখের বড় দেমাক, বড় অহংকারী সে। ডাকলে আসে না। কাঁদো, প্রার্থনা করো, চিৎকার করো, মিনতি করো -- সুখের হৃদয় গলবে না। কখনো কখনো অবশ্য সে আসে। কিন্তু এলেও থাকতে চায় না বেশিক্ষণ। সর্বদাই তার পালাই পালাই ভাব। সংসারে তার আগমন যেন হরিণের শিঙে মাছি বসার মতোই ক্ষণস্থায়ী। কোথাও নেই তার স্থায়ী ঠিকানা। সে যাযাবর, চঞ্চল, অস্থির, ক্ষণিকের অতিথি।

কান্নার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাব। সুখ আর আনন্দে ভরে ওঠে সংসার। কিন্তু এই সুখ বারবার হয়ে ওঠে বিপন্ন -- কখনো রোগ-শোক-যন্ত্রণায়, কখনো দারিদ্র্যে, কখনো বা প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ায় বা স্বপ্নভঙ্গে। মানব মন হতাশায় বলে ওঠে -- 'ওগো সুখদিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আসে না (রবীন্দ্রনাথ) অথবা 'সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান' (ঐ)।

সংসারে নরনারীর প্রেম-ভালোবাসা এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু প্রেমের সুখ ক্ষণস্থায়ী। কবি গেয়েছেন -- 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন /তবে কেন মিছে ভালোবাসা।' কিন্তু প্রেম কি কেবল ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্যে? কবির সুরে বলা যায় 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না/শুধু সুখ চলে যায়।' মায়ার ছলনা বুঝি এরকমই! কবি-দার্শনিক হয়তো পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করবেন -- 'শিখাও প্রেমের শিক্ষা' কিন্তু কোন্ প্রেম? মহাকবির মহামন্ত্র --'যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন হয়না প্রভু/ যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার'। কিন্তু এমন মানসিকতা আর ক'জনের? সাধারণ মানুষ সুখের জন্যে ভালোবাসে, ভালোবেসে সুখ চায়। কিন্তু পায় ক'জন? কবির ভাষায়, 'জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা।' কবি জ্ঞানদাসের শ্রীরাধিকা

তাই আক্ষেপ ক'রে বলেছেন -- 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কবিতায় নিঃসঙ্গ সুখকে প্রশ্ন করেছিলেন --'সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর?/সুখ কার করিস রে আশা?' সুখ কেঁদে কেঁদে উত্তর দিয়েছিল 'ভালোবাসা, ভালোবাসা'। যেখানে সুখ, সেখানে ভালোবাসা বিরল। যেখানে ভালোবাসা, সেখানে সুখ দুর্লক্ষ্য।

প্রশ্ন হতে পারে -- তাহলে কি মিলনেও সুখ নেই? আছে। কিন্তু তা বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা দানের মতোই। তা যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠা রংমশাল, সৈকতভূমিতে হঠাৎ আছড়ে পড়া ফেনশীর্ষ তরঙ্গ! মিলনজনিত সুখ মানুষকে কখনো কখনো ক্লান্ত করে, পীড়া দেয়। সুখশ্রান্ত প্রেমিক আক্ষেপ করে -- 'ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে / কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়/পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে' (রবীন্দ্রনাথ)।

প্রেমের মতো ধর্মও মানবজীবনে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো সহজাত। কিন্তু প্রকৃত ধর্মজীবনে সুখের কোনো স্থান নেই। যাঁরা যোগী বা সাধক তাঁদের তো 'সকল সুখে আগুন' জ্বালাতেই হবে। না হলে মিলবে না প্রার্থিত ও বাঞ্ছিত সিদ্ধি, মিলবে না ঊর্ধের আলোকবর্ষণ। সুখের মাঝে হয়তো দৈবাৎ পরম দেবতার দেখা মেলে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাঁকে সমস্ত অন্তর জুড়ে পাওয়া যায় না। তাই বুঝি সাধক কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন -- 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি/ দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।' সাধক চান বিশুদ্ধ আনন্দ, সুখ নয়। আনন্দের সঙ্গে আবার সুখের বনিবনা হয় না, কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায়, 'সুখেতে আসক্তি যার/ আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।' তাই সুখ নয়, বিশুদ্ধ আনন্দ; আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নয়, পরম পিতার স্নেহভরা কোলই সাধকের অন্বিষ্ট -- 'সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে/যাক না গো সুখ জ্বলে' (রবীন্দ্রনাথ)। মানুষ যখন জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত হয় না, তখন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ সুখকে আনন্দ ভেবে তার নেশায় মেতে থাকে। অবশেষে একদিন যখন সে অবিদ্যামুক্ত হয়, তার হৃদয় নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ ঘটে, তখন কবির সুরে সে সত্যোচ্চারণ করে -- 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ/সুখের খেলায় বেলা গেছে/পাইনি তো আনন্দ।'

সাধারণ মানুষ সুখ-ভিক্ষু। অশান্ত, অতৃপ্ত, বিভ্রান্ত কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছে সুখের ঠিকানা। কিন্তু সুখ প্রতিবন্ধী, বধির। তাই কারুর ডাক তার কানে পৌঁছয় না।

তাহলে সত্যিই কি সুখ অপ্রাপ্য? উত্তর দিয়েছেন প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি -- 'ভূমৈব সুখমস্তি।' আর কিছুতে নয়, একমাত্র ভূমাতেই সুখ। ভূমানন্দ লাভই তাই মানুষের স্থায়ী সুখের একমাত্র লক্ষ্য।

মহাভাগবত বিদুর

মহাভারত যেন এক বিশাল জনসমুদ্র! কত বিচিত্র চরিত্রের এখানে সমাবেশ ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই বিচিত্র চরিত্র চিত্রশালার এক অবিস্মরণীয় চরিত্র মহাভাগবত বিদুর।

মহাভারতের কৃষ্ণ আমাদের কাছে স্বয়ং ঈশ্বর রূপে প্রতিভাত। তাঁর কত রূপ, কত লীলাবৈচিত্র্য। তিনি অর্জুনের সখা হলেও সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু বিদুরকে আমাদের কাছের মানুষ, মনের মানুষ বলে চিনে নিতে ভুল হয় না।

জন্ম মুহূর্ত থেকেই মহামতি বিদুর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেননা রাজসিক আভিজাত্যের শিরোপা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হননি। তিনি শূদ্রাণী দাসীর গর্ভজাত, তাই সিংহাসন লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। ধৃতরাষ্ট্রও সিংহাসন পান নি, কিন্তু তার কারণ তাঁর জন্মান্ধতা। রাজা হলেন পাণ্ডু।

বিদুর রাজা হননি, কিন্তু তিনি ছিলেন মুর্তিমান ধর্ম। মহর্ষি মাণ্ডব্যের অভিশাপে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ বিদুররূপে আবির্ভূত হন — 'ধর্ম্মো বিদুররূপেন শূদ্রযোনাবজায়ত।' তাঁর পিতা মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের জন্মক্ষণে বিদুরের মাকে বলেছিলেন যে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিদুর অবতীর্ণ হচ্ছেন। 'ধর্ম্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ববুদ্ধিমতাং বরঃ' — ধর্মাত্মা এবং বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ হিসাবে পৃথিবীতে তিনি বন্দিত হবেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বলেন — 'প্রজ্ঞা চ তে ভার্গবস্যেব শুদ্ধা — স্বয়ং শুক্রাচার্যের মতোই তোমার প্রজ্ঞা শুদ্ধা। কৃষ্ণের সামনে কুন্তী তাঁর সম্বন্ধে ভারী সুন্দর মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন যে যদিও বিদুর দাসী পুত্র, তবু তিনি ভারত বংশের একমাত্র পূজ্য ব্যক্তি।

বিদুর শব্দের উৎপত্তি 'বিদ্' ধাতু থেকে। 'বিদ্' অর্থ জানা। বিদুর ছিলেন যথার্থ জ্ঞানী। 'সর্ব্বত্র বিহিতো ধর্মঃ' — এই মন্ত্র যাঁর সহজ সরল জীবনে মূর্ত, তাঁকে জ্ঞানী ছাড়া আর কিই বা বলা যায়? এহেন জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মার শূদ্র জন্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী বলেন — 'ঋষি কবি দেখাতে চেয়েছেন যে স্বয়ং ধর্ম লোকশিক্ষার জন্য দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে মানুষ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও ধর্ম্মাচরণ করতে পারে।'

শুধু ধর্মাচরণ করা নয়, ধর্ম্মের বাণী শোনানোও নয় — ধর্ম্মকে চোখের মণির মতো রক্ষা করাই ছিল তাঁর অভিষ্ট। তাই বার বার তিনি দুর্যোধনকে ধিক্কার দিয়েছেন, সদুপদেশ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ঘুমন্ত বিবেক জাগাতে চেয়েছেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ, দোদুল্যমান চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের কোনো উপদেশই গ্রহণ করেননি। বিদুরের উপদেশ মতো ধৃতরাষ্ট্র যদি দুর্যোধনকে ত্যাগ করতেন, স্নেহ এবং ন্যায়বিচার দিয়ে পাণ্ডবদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন, বন্ধ করতেন কপট দ্যূতক্রীড়া, ব্যর্থ করে দিতেন জতুগৃহদাহের হীন প্রচেষ্টা — তাহলে হয়তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই হত না, আর অন্যভাবে রচিত হত মহাভারত!

ধর্মের সার তত্ত্ব বার বার উচ্চারিত হয়েছে বিদুরের মুখে। কুলরক্ষার জন্য একজনকে পরিত্যাগ করবে। গ্রাম রক্ষার জন্য কুল পরিত্যাগ করবে। জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করবে এবং আত্মরক্ষার জন্য পরিত্যাগ করবে, সমস্ত পৃথিবী। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের এই উপদেশ তো প্রবাদবাক্যে পরিণত! বিদুরের ধর্ম্মোপদেশে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান বা যাগ যজ্ঞের কথা নেই, তাই সহজেই সর্ব্বতোভাবে আচরণীয়। 'উদ্যোগ পর্বে' তাঁর অপূর্ব উপদেশামৃত মহাভারতের এক অমূল্য সম্পদ। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে বিদুর প্রসঙ্গ। মহামুনি মৈত্রেয়-বিদুর কথোপকথন ভাগবতের এক শাশ্বত সম্পদ। মৈত্রেয়-মুখে ঐ ভাগবত আলোচনা শুনে অভিভূত বিদুর বলেন — করুণাত্মা, আপনি আজ আমাকে অজ্ঞানের পরপার ও অকিঞ্চন ভক্তজনের দর্শনীয় জনার্দন হরিকে দর্শন করালেন।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসছেন জেনে ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবকে 'ঘুষ' দিতে চাইলেন। বিদুরকে বললেন — বিদুর, কৃষ্ণ আসছেন। তাঁকে যদি আমি প্রচুর ধনরত্ন, দাসদাসী দিই আর তাঁর আতিথ্যের দারুন ব্যবস্থা করি, তাহলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষের কথা শুনবেন, নয় কি? স্থিতপ্রজ্ঞ বিদুর হেসে বললেন — 'উপকরণ দিয়ে আপনি কৃষ্ণকে বশীভূত করতে চান? কৃষ্ণ মঙ্গল-কলস, পাদ্য ও কুশল প্রশ্ন ছাড়া আপনাদের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করেন না।' তাই দেখা যায় দুর্যোধনের রাজোচিত নিমন্ত্রণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ মহাজনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণ বিদুরের বাড়িতে গিয়ে পরমানন্দে অন্নগ্রহণ করলেন। কেননা বিদুর শুদ্ধাচারী, নিষ্কাম, ধর্ম্মাত্মা। তাঁর প্রদত্ত অন্ন আন্তরিক, পবিত্র ও শুচিস্নিগ্ধ।

যুদ্ধ, লোকক্ষয় ও ধ্বংস যে অনিবার্য — দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিসত্তম বিদুর তা বুঝতে পেরেছিলেন। কেউ তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন নি। দোদুল্যচিত্ত পুত্রান্ধ ধৃতরাষ্ট্র আর মূঢ়মতি দুর্যোধন মহাসর্বনাশ ডেকে আনলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হচ্ছে আঠার দিন ধরে, অথচ ঐ সময়ে বিদুর অনুপস্থিত। কোনো মধুর বাক্য, কোনো

ধর্ম্মোপদেশ, কোনো সঠিক পথনির্দেশের কথা তিনি বলেন নি। ধর্ম্ম যেখানে পরাভূত সেখানে বিদুর নেই। ন্যায়-নীতি-বিবেক যেখানে বিসর্জিত সেখানে বিদুর-মূর্ত্তি অন্তর্হিত। কে শুনবে সত্য-প্রেম-কল্যাণের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি? ধৃতরাষ্ট্র? দুর্যোধন? দুঃশাসন?

যুদ্ধ শেষ হলো। আবার দেখা গেল বিদুরকে। সেই সৌম্য সহাস মূর্তি, মুখে ধর্ম্মোপদেশ। ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে পনের বছর রাজ্য পরিচালনা করেন পাণ্ডবরা। ঐ সময় বিদুর গ্রহণ করেছিলেন এক অসাধারণ ভূমিকা। রাজকার্য পরিচালনায় ধর্ম্মাত্মার উপদেশ নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ সকলেই অনুমোদন করতেন। কিন্তু বিদুরকে চলে যেতে হল ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বনবাসে। সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মেছে ধৃতরাষ্ট্রের। দুর্বিষহ শোক তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ভীমের বাক্যবাণ যে অসহ্য!

বনবাসে বিদুর মহাতপস্বী -- নির্ব্বাক, মগ্নমৌন, সংযত, সত্যে স্থিত। যুধিষ্ঠির দেখা করতে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রশ্ন করলেন -- 'মহাত্মা বিদুর কোথায়? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?' ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন -- 'বৎস, তোমাদের পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্মাবশিষ্ট হয়ে ঘোরতর তপস্যা করছেন'। যিনি মূর্তিমান ধর্ম, শুদ্ধাচারী, অপাপবিদ্ধ, শ্রেয় লাভের জন্য তাঁকেও কঠোর সাধনা, বিরল কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল -- মহাকাব্যের ঋষি-কবি লোকশিক্ষার জন্য এটাই দেখাতে চেয়েছেন।

যুধিষ্ঠির বিদুরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। গভীর বনে তাঁর সাক্ষাৎও পেলেন। ব্যাকুল যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন -- 'আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির, আমাকে চিনতে পারছেন?' বিদুর স্থির! যেন এক নিবাত নিষ্কম্প প্রসন্ন দীপশিখা।! বৃক্ষ অবলম্বন করে তিনি দণ্ডায়মান, শরীর নিশ্চেতন। তাঁর আত্মা প্রবেশ করেছে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মধ্যে। যেন এই ক্ষণটুকুর জন্যই মহাতপস্বী বিদুর প্রতীক্ষা করছিলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পরে বলেন -- 'বিদুর সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমদ্বারা বিখ্যাত হয়েছেন। ঐ অসাধারণ ধী-সম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম যোগবলে যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ, পৃথিবীর মতো ধর্মও ইহলোক-পরলোকে বিদ্যমান। তিনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত। যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির।'

ধর্মের মৃত্যু বা ধ্বংস হয় না। তিনি অজর, অমর, শাশ্বত। শোকার্ত যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে তাই শোনা গেল দৈববাণী -- 'মহারাজ। মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম লাভ করেছেন। আপনি তাঁর দেহ দগ্ধ করবেন না। তিনি সান্তানিক নামক লোক সমুদয় লাভ করেছেন। তাঁর জন্য শোক করা অনুচিত।'

বিদুর দাসীপুত্র, কিন্তু অনেক মহারাজপুত্র তাঁর পাদনখকণার যোগ্য নন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন মহাভাগবত।

অথ রাম সীতা কথন

ত্রিলোকদর্শী নারদের ভাষায় -- গাম্ভীর্যে যিনি সাগরপ্রতিম, ধৈর্যে হিমাচল, বলবীর্যে বিষ্ণু, সৌন্দর্যে চন্দ্র, ক্ষমায় ধরিত্রী এবং সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম -- তিনি রামায়ণের অবিস্মরণীয় নায়ক রামচন্দ্র। আর তাঁর সীতা? যাঁর সম্বন্ধে অত্রি মুনির সহধর্মিনী অনসূয়া বলেছিলেন -- 'হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়'(কৃত্তিবাস)। অশেষ গুণবতী ছিলেন ঐ মহীয়সী নারী। অনেকের ধারণা নারী সমাজের আদর্শ ঐ সীতার জীবন "ঘনীভূত অশ্রুর মুক্তমালা।' তিনি 'জনম দুঃখিনী' ছিলেন, এ রকম ধারণাও বহু ব্যক্তির। কিন্তু বর্তমান লেখক মনে করেন সীতার চেয়ে রামের দুঃখই ছিল বেশী।

'কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ কর্ম যৎ শুভম্' অর্থাৎ 'এই কর্মভূমি আমি পেয়েছি, এখানে শুভ কর্ম করাই আমাদের কর্তব্য' -- রামচন্দ্র শুভ কর্মের মাধ্যমে তাঁর এই উক্তিকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু এহেন মহাপুরুষের জীবনের বহু বছর কেটেছিল দুঃসহ দুঃখের মধ্যে। তাঁর শোক, বেদনা ও যন্ত্রণা ছিল সীতার চেয়ে অনেক বেশী।

বনবাসের কষ্ট সীতাকে সহ্য করতে হয়েছে। রাবণ তাঁকে হরণ করেছে। তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে অগ্নি পরীক্ষায়। রাম তাঁকে পাঠিয়েছেন বাল্মীকি আশ্রমে, তারপর তিনি প্রবেশ করেছেন পাতালে। এসব ঘটনা সত্যিই বড় মর্মস্পর্শী। কিন্তু সীতার জীবনের আর একটি অধ্যায় আছে যা সুন্দর ও মধুর। সে অধ্যায় সতীনারীর অশ্রুজলে সিক্ত হয়নি। বিবাহের আগে জনক রাজার গৃহে সীতা সুখেই ছিলেন। বিবাহ হলো পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামের সঙ্গে। রামের মতো স্বামী পেলেন। তাঁর আর দুঃখ কিসে? আদর্শ স্বামী পাওয়া না গেলে যে কোন সতী নারীর জীবনই ব্যর্থ হয়ে যায়। সীতার স্বামীভাগ্য ঈর্ষনীয়। বিবাহের পর বারো বছর রাম ও সীতা পরম সুখে কাটান। রাম ছিলেন সীতাগতপ্রাণ এবং সীতাও 'একক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে হৃদয়ে হইতে বহিষ্কৃত

করিতেন না।' তাহলে সীতা যে 'জনম দুখিনী' ছিলেন না তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিবাহের বারো বছর পর্যন্ত রাম সীতা দুজনের জীবনই ছিল আনন্দে পূর্ণ।

তারপরই আসে বনবাসের পালা। রামের সঙ্গে সীতা যদি বনবাসে না যেতেন, তাহলে সীতার জীবন রাম-বিরহে বিবর্ণ হয়ে উঠতো। দীর্ঘকাল তাঁকে অতিবাহিত করতে হত প্রিয়সঙ্গহীন নিঃসঙ্গ জীবন। কিন্তু তা হয়নি। সীতা স্বেচ্ছায় বনবাসে যেতে চেয়েছেন। বনবাসের জীবনে রাজসুখ ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল।

সীতার জীবনের প্রথম দুঃখ -- রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ। অশোক-কাননে তাঁর বন্দিনী মূর্তি দেখে আমরা সকলেই শোকার্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও একদিক দিয়ে তিনি সুখী ছিলেন। পরগৃহে বাস করেও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দেহ মনের শুচিতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ! তাছাড়া এই ঘটনা কি অপ্রত্যাশিত ছিল? সীতা হনুমানকে জানান, 'আমি আগেই জানতাম যে দশা বিপাকে আমায় এ রকম সহ্য করতে হবে।' ভবিতব্য সম্বন্ধে যিনি সজাগ ছিলেন তিনি মানসিকভাবে ঐ ঘটনার জন্য নিশ্চয়ই তৈরী ছিলেন। ঐ ঘটনা যদি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যেত, তাহলে রাম জায়ার বেদনা কি গভীরতর হত না?

রাবণ সীতা হরণ করলেন। কিন্তু সীতা বিরহে রামের দুঃখ, রাম বিহনে সীতার দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী। বিরহ সীতাকে উন্মাদিনী করেনি, কিন্তু রামকে করেছে পাগলপারা। সীতা রামের কথা ভেবে লঙ্কার মাটি ভিজিয়ে ফেলেছেন চোখের জলে। আর মহাবল পরাক্রান্ত রাম? নিঃসঙ্গ বিরহী রাম প্রশ্ন করছেন অচেতন পদার্থকে কিংবা ইতর প্রাণীকে --'বলো, কোথায় আমার জানকী?' জিজ্ঞেস করেছেন সূর্য-বায়ু নদীকে, অরণ্য পর্বত মৃগকে 'তোমরা জান কোথায় আমার প্রেয়সী?' রামের ব্যক্তিগত দুঃখ সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অসীমে। তাই এই বেদনার গভীরতা অতলস্পর্শী। রামায়ণের এই অংশ পড়লে মনে হয়, ঐ মহাকাব্যের সবচেয়ে ট্র্যাজিক চরিত্র আর কেউ নন, স্বয়ং রাম।

অবশেষে রাম সীতা উদ্ধার করলেন। ফিরে গিয়ে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসলেন, আর রাণী হলেন সীতা। অগ্নিশুদ্ধা সীতা স্বামীর সঙ্গে, বাল্মীকির ভাষায় 'ভোগসুখে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করলেন।' কাজেই দেখা যাচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন বেদনায় রাম বা সীতা কাউকেই কষ্ট পেতে হয়নি।

গর্ভবতী সীতার চারিত্রিক শুচিতা নিয়ে প্রজারা সন্দেহ প্রকাশ করায় রাম নিরুপায় হয়ে সীতাকে পাঠিয়ে দিলেন বাল্মীকির আশ্রমে। সীতার জীবনের এটি একটি করুণতম ঘটনা। কিন্তু স্বামীসঙ্গবিচ্যুতা সীতা আশ্রমের মনোরম পরিবেশে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে, মুনি ঋষিদের স্নেহচ্ছায়ায় ভালোই ছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে ছিল তাঁর যমজ সন্তান লব-কুশ। বেদনা ছিল একটিই -- রাম তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এই বেদনা সত্যিই দুঃসহ।

কিন্তু সীতাকে পরিত্যাগ করে রামের অন্তর কি বেদনায় আলোড়িত হয়নি? অপবাদের ভয়ে নিষ্কলঙ্কা সতী স্ত্রীকে বাল্মীকির আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর কোমল হৃদয় কি শতধাদীর্ণ হয়নি? বাল্মীকি লিখেছেন, রাম উৎকৃষ্ট আসনে বসে রয়েছেন এবং তিনি 'দুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন করিতেছেন।'

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে সীতা অযোধ্যায় এসেছিলেন। রাম তাঁকে আবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন। অভিমানিনী সীতা পাতাল প্রবেশ করলেন। চলে গিয়ে 'বেঁচে' গেলেন সীতা। কিন্তু তাঁর বিরহে রাম যে শোক পেলেন তার তুলনা কোথায়? পৃথিবী তাঁর কাছে শূন্যময় ও নিরানন্দ হয়ে গেল। তারপর আরো বহু বছর রাম জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে জীবন ছিল বিবর্ণ, বিষাদক্লিষ্ট ও নিরানন্দ। পাতাল প্রবেশ করে সীতা তো প্রায় 'শহীদের' মর্যাদা পেলেন। কিন্তু বেঁচে থেকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিলে তিলে দগ্ধ হলেন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ রামচন্দ্র! সীতার দুঃখবেদনার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে কত কাব্য-কাহিনী। কিন্তু রামচন্দ্রের যন্ত্রণা ও বেদনা অনেকাংশে থেকে গিয়েছে অকথিত।

চলমান তীর্থের তীর্থ-পরিক্রমা

যোগসিদ্ধ সাধু মহাত্মারাই 'চলমান তীর্থ'। তবু তাঁরাও মাঝে তীর্থ পরিক্রমা করেন -- কখনও ভক্ত সঙ্গে, কখনও একা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদেরই অন্যতম। সব তীর্থের ঘনীভূত নির্যাস তিনি। ভক্তির শিখাটি অকম্পিত রেখে তিনিও সাধ্যমত ঘুরে বেড়িয়েছেন এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে।

কেন তীর্থে যায় মানুষ? ঠাকুর বলতেন -- যেখানে বহুদিন ধরে বহু ভক্ত জপ-তপ, পূজা উপাসনা ক'রে আসছে, সেখানে ঈশ্বরীয় ভাব জমাট বেঁধে থাকে। সহজেই সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হয়। ঈশ্বর সর্বত্র, কিন্তু তাঁর বিশেষ প্রকাশ তীর্থে। তাই যুগযুগান্তর থেকে তীর্থ পরিক্রমা করে আসছেন অগণিত সাধু-মহাত্মা এবং ভক্তমণ্ডলী।

১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাস। ঠাকুর চললেন তীর্থে। সঙ্গে মথুরবাবু আর ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ? ভাবা যায়? তাঁর পূজা পদ্ধতি, ভাবানুভূতি আচার আচরণ কি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনীয়?

বৈদ্যনাথধামে যাবার পথে সকলে প্রবেশ করলেন এক গ্রামে। কিন্তু এ কি গ্রাম। চমকে গেলেন ঠাকুর। চারিদিকে দীন-দরিদ্র মানুষ! রুক্ষ তেলবিহীন চুল, জীর্ণ-চীর বসন, ক্লান্ত অভুক্ত কঙ্কালসার মূর্তি!

পরম ভাগবত শ্রীরামকৃষ্ণ বিচলিত হলেন। আর্তের সেবাই তো ঈশ্বর সেবা -

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।'

বিগলিত হল দীনদয়াল ঠাকুরের হৃদয়। মথুরকে বললেন -- এদের পেট ভরে খেতে দাও, কাপড় দাও, মাথায় মাখবার তেল দাও।

ব্যয়কুণ্ঠ মথুর দ্বিধাগ্রস্ত। উত্তেজিত হলেন ঠাকুর, বললেন -- 'দূর শালা!" তোর কাশী আমি যাবো না। আমি এখানেই ওদের সঙ্গেই থাকবো।

ঠাকুর মিশে গেলেন দীন দুঃখীদের ভীড়ে। অবশেষে রাজী হলেন মথুর। পূর্ণ হল ঠাকুরের দাবী।

ঘটনাটি ছোট্ট, কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস দেয়।

ঠাকুর এবার এলেন সর্বতীর্থসার কাশীতে। তাঁর চোখে কাশী ইট কাঠ পাথরের নয়, তা সুবর্ণময়ী। এখানে এসে তাঁর মনে এমন ভাব জেগেছিল যে তিনি সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হতেন। বেশ কিছুদিন তিনি পালকি ক'রে বেনারসের বাইরে গিয়ে ঐ কর্ম সম্পাদন করে আসতেন।

দিব্যভাবে আবিষ্ট ঠাকুর রোজ পানসি চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতেন। একদিন হল এক অদ্ভুত দর্শন! মণিকর্ণিকার পাশে শ্মশানে শবদাহ হচ্ছে দেখেই তিনি সমাধিস্থ! ভাবনেত্রে দেখলেন, চিতার পাশে এসে স্বয়ং বিশ্বনাথ দেহীকে তুলে নিচ্ছেন আর তার কানে শোনাচ্ছেন তারক ব্রহ্ম নাম। ঠাকুর ভাবাবেগে মহাকালীকেও দেখলেন -- চিতার ওপর বসে তিনি জীবের সংস্কার বন্ধন খুলে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন অখণ্ডের ঘরে।

ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী তখন কাশী আলো করে রয়েছেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 'দেখলুম ত্রৈলঙ্গ স্বামী', ভক্ত সঙ্গে প্রায়ই বলতেন তিনি, 'যেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ শরীর আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন।' দুই ক্ষণজন্মা মহাযোগীর মধ্যে ইশারায় হয়েছিল ভাবের আদান প্রদান।

কাশীর পর প্রয়াগ। সেখানে অতিবাহিত করলেন তিন রাত। তারপর এলেন আর এক মহাতীর্থে -- বৃন্দাবনে। ব্যাকুল চিত্তে দর্শন করলেন নিধুবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন। ভাবতন্ময় অবস্থায় আলিঙ্গন করতে গেলেন বাঁকাবিহারীর মূর্তি। দিব্য আবেগে উঠে গেলেন গিরিগোবর্ধন চূড়ায়। কিছুতেই নামতে চান না। শেষে লোক পাঠিয়ে নামানো হল। অপরাহ্নে যমুনার চড়ার ওপর দিয়ে রাখাল গরু চরিয়ে ফিরছে, ব্যাকুলভাবে উন্মাদের মতো 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে সেদিকে ছুটে গেলেন। দেখলেন কালীয়দমন ঘাট। আবার সেই অভূতপূর্ব উদ্দীপন! আবার সেই অপার্থিব মহাভাব।

কৃষ্ণপ্রাণাধিকা গঙ্গামায়ী থাকতেন বৃন্দাবনে। তাঁকে দেখে ঠাকুর অভিভূত! এতদিনে পেয়েছেন মনের মতো এক মহাসাধিকাকে। গঙ্গামায়ীও ঠাকুরকে দেখে যেন

হাতে স্বর্গ পেলেন। তাঁর কাছে ঠাকুর 'দুলালী'। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে যে রাধিকার মহাভাব মূর্ত। পরিতৃপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবলেন, এখানেই থেকে যাবেন। আর ফিরবেন না। কিন্তু অবতারকল্প মহাসাধকেরও পিছুটান থাকে। ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁর মা চন্দ্রমণি দেবীর জন্যে। মা রয়েছেন একলা। কে তাঁকে দেখবেন? কে করবেন সেবা শুশ্রূষা? কে বসবেন তাঁর পবিত্র কোলটি আলো করে?

অগত্যা 'যাবার সময় হল বিহঙ্গে'র। ফেরার সময় আর একবার কাশী ঘুরে গেলেন।

মথুরবাবুর ইচ্ছে ছিল গয়া যাবার। কিন্তু ঠাকুর নারাজ। গয়াধামে স্বয়ং গদাধর ঠাকুরের পিতাকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। গয়ায় গেলে ঠাকুরের শরীর থাকবে না, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

অতএব এবারের মতো যাত্রা হল শেষ। 'সচল তীর্থ' 'অচল' হলেন দক্ষিণেশ্বরে।

মথুরবাবুর সঙ্গে এরপর ঠাকুর একবার নবদ্বীপ ও কালনা পরিভ্রমণ করেন। উৎসাহী পাঠক স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

তীর্থে যাবো অথচ তার মাহাত্ম্য কীর্তন করব না? কি দেখলাম, কি পেলাম, সেই অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করব না? অর্থ, সংসার আর বিষয়-বিষে অন্তর ভারাক্রান্ত করব? উপদেশ দিয়েছেন ঠাকুর -- তীর্থ দেখে এসে 'জাবর কাটবে'। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মহিমা নিয়ে রোমন্থন করবে, যাতে তীর্থস্থানে জেগে ওঠা ভাব বহুদিন বুকের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

ঠাকুর! তীর্থ পরিভ্রমণ শেষে আমরাও জাবর কাটি। কাজকর্মের অবসরে, নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আমরাও মনে মনে তীর্থ ভ্রমণের স্মৃতিচারণা করি এবং They flash upon the inward eye which is the bliss of solitude.

বোধন ও বিসর্জন

দুঃখ করে গেয়েছেন রামপ্রসাদ -- এমন মানব জমিন রইল পতিত/আবাদ করলে ফলতো সোনা।' বাস্তবিক সৌভাগ্যক্রমে আমরা লাভ করেছি দুর্লভ মানব জীবন। এই জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলাই তো আমাদের অভিষ্ট। কিন্তু উপযুক্ত আবাদের অভাবে আমাদের মতো অনেকের জীবন আগাছায় ভরে গেছে। অথচ আমরা যদি একটু সচেতন হয়ে আবাদ করি তাহলে সার্থক হবে আমাদের জীবন।

কিন্তু কিভাবে মন কৃষিকার্য করবে? কিভাবে পাতত জমিতে সোনা ফলবে? এরজন্যে প্রয়োজন 'বোধন' ও 'বিসর্জন'। যা কিছু মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে, সীমা থেকে নিয়ে যায় অসীমে, অন্ধ তমসা থেকে আলোয় উত্তরণের নির্দেশ দেয় সেগুলি গ্রহণ করাই হল বোধন। আর যা কিছু মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, শ্রেয় থেকে বিযুক্ত করে, বাসনা-কামনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় -- তা পরিত্যাগ করাই হল বিসর্জন। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, এখনই শুরু করতে পারি এই বোধন ও বিসর্জনের পালা। ঢাক ঢোল পিটিয়ে নয় -- নীরবে, নিভৃতে, সবার অগোচরে।

বোধনের কাজটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম কাজটি হল বিশ্বাস। যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন --'যদি তোমাদের সরষে প্রমাণ বিশ্বাস থাকে ও এই পাহাড়টাকে বল -- এখান থেকে সরে ওখানে যা, তাহলে তা নিশ্চয়ই যাবে।' মনের গহন অন্ধকারে বিশ্বাসের অকম্পিত দীপশিখাটিকে যেন জ্বালিয়ে রাখতে পারি। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ঝোড়ো হাওয়ায় তা যেন কখনই নিভে না যায়। একদিন হয়তো তারই অমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে চিরসুন্দরের অপরূপ মুখচ্ছবি।

'বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ?' কেদারকে বোঝাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। আর তার সেতুর দরকার হয়নি।'

যতবার, নিই ছাড়ি, প্রশ্বাস নিঃশ্বাস
ততবার বলি 'প্রভু
না হয় শিথিল কভু
তোমা প্রতি মোর প্রেম অটল বিশ্বাস।

বিশ্বাসের সঙ্গে চাই সাধন ভজন, সৎসঙ্গ আর ব্যাকুলতা, ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের তীব্র আস্পৃহা, সব অপূর্ণতা যাতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তার জন্য সুতীব্র অভীপ্সা। পণ্ডিচেরীর শ্রীমা বলেছেন -- 'সবার আগে চাই -- অন্তরের এই অগ্নিশিখাটি, এই তীব্র আকুতি, জ্যোতির জন্যে এই একান্ত প্রয়োজনবোধ। এ হল একরকমের এক জ্বলন্ত উদ্দীপনা, যা তোমাকে আবিষ্ট করে ফেলবে। এ হল নিজেকে একেবারে গলিয়ে মিলিয়ে ভগবানের সঙ্গে এক করে দেওয়ার পরিপূর্ণ আত্মদানের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে সময় তোমাকে হতে হবে অকপট, অখণ্ড ঐকান্তিকতায় পূর্ণ এবং যতদুর সম্ভব সর্বাঙ্গীনভাবে সমর্পিত।

নদী যেমন ব্যাকুলভাবে সাগরপানে যায়
এ মন কভু তেমন করে তোমার পানে ধায়।

বিশ্বাস আর এই ব্যাকুলতা হয়তো আমাদের এনে দেবে সাত রাজার ধন এক মানিক -- দৈবী কৃপা।

বোধনের তৃতীয় কাজটি হল সমর্পণ -- সানন্দ, নিঃস্বার্থ এবং দ্বিধাহীন সমর্পণ। কৃষ্ণের কাছে এভাবেই সমর্পণ করেছিলেন শ্রীরাধা --

'বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ
দেহমন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।'

নিজেকে, নিজের সমস্ত সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার চেয়ে ভালো কাজ আর কি হতে পারে?

তোমার পায়ে উজাড় করে
' দিলাম আমার যা কিছু সব
নিঃস্ব আমি তবু আমার
প্রাণে খুশির মহোৎসব।

বোধনের পরে বিসর্জনের পালা। এটি সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলাম, তাঁর জন্যে ব্যাকুল হলাম, দেখা গেল এত সব করেও বিশেষ কিছু হল না। না হবার কারণ, বিসর্জনের পালা শুরু হয়নি।

আমরা ভগবানকে আহ্বান করছি। তর্কের খাতিরে ধরা যাক তিনি এলেন। কিন্তু কোথায় বসবেন তিনি? নোংরা দুর্গন্ধের মধ্যে? হৃদয়ের মধ্যে যে সিংহাসনটি রয়েছে, সেটিও যে খালি নেই। সেখানে গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছেন অটল অনড় 'আমি রাজা'। আর তাঁর চারপাশে ঘোরাফেরা করছেন সন্দেহ, অবিশ্বাস, নীচতা, স্বার্থপরতা, প্রমুখ বড় বড় মন্ত্রী। রাহুর মতো 'আমি রাজারও' তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি। জগতের সমস্ত প্রেয় বস্তুগুলির প্রতি তাঁর দুর্নিবার লোভ।

যেখানে 'আমি' সেখানে 'তিনি' নেই ---
ইচ্ছা যে হয়, হৃদয়-রাজ্য করব জীবন-স্বামীময়
কিন্তু সেখায় 'আমি রাজা, রাজ্যটি তাঁর আমি ময়।
আমি নামের কেল্লা থেকে যতই ডাকো 'প্রভু-প্রভু'
পাবে নাকো দেখাটি তাঁর এই জনমে তুমি কভু।

তাই সর্বাগ্রে আমি-রাজার কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, তাঁকে পাঠাতে হবে দূর নির্বাসনে, বধ করতে হবে তাঁর মন্ত্রীদের। অতি দুরূহ এই কাজ, ছোটোখাটো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বলা যেতে পারে। হয়তো এক জীবনে তা সম্ভবও নয়। তবু সংগ্রাম করতে হবে, গুরু প্রদর্শিত পথে সাধন ভজনের মাধ্যমে বিসর্জনের এই পালাটি সম্পন্ন করতে হবে। অবশ্য যদি ঈশ্বরের কৃপাকণা বর্ষিত হয়, ঊর্দ্ধলোক থেকে নেমে আসে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', তখন কাজটি সহজতর হবে। ঠাকুর বলতেন -- 'তুমি এক পা বাড়ালে ভগবান দশ পা বাড়িয়ে এগিয়ে আসবেন'। তাই শুরু হোক পথ চলা। বাড়িয়েই দেখি না এক পা।

বোধন ও বিসর্জনের ব্যাপারটি সম্পন্ন করা গেল। ব্যস, এতেই কার্যোদ্ধার হবে, তাই না? একেবারেই নয়। কেবল ক্ষেত্র তৈরী হল, বপন করা হল ঈশ্বরানুগের বীজ। বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গেই কি ফল পাওয়া যায়? সার দিতে হবে না? জল বাতাস আলোয় ভরিয়ে দিতে হবে না ক্ষেত্রটিকে? বীজটিকে রক্ষার জন্য নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে হবে না? মনে রাখতে হবে শবরীর প্রতীক্ষার কথা। শ্রীরামের স্পর্শ কি এত সহজে পাওয়া যায়?

এভাবে বোধন ও বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত সাধন-ভজনের সাহায্যে নিঃশব্দে আমরা যদি একটু এগিয়ে যাই, তাহলে সুন্দরতর হয়ে উঠবে আমাদের জীবন, 'সকল কাঁটা ধন্য করে' একদিন না একদিন ফুল ফুটবেই ফুটবে।

কিন্তু পরিশেষে আমরা জানি যে যিনি আমাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি শুভবোধ এবং দুর্লভ মোক্ষ প্রদানকারী, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুর শরণাগতি ভিন্ন কোন প্রাপ্তিই সম্ভব নয়। তাই জগদগুরু শঙ্করাচার্যের ভাষায় তাঁকে প্রণাম জানাই --

কামাদি সর্প ব্রজগারুরাভ্যাম্।
বিবেক বৈরাগ্য নিধি প্রদাভ্যাম্।
বোধ প্রদাভ্যাম্ দ্রুত মোক্ষদাভ্যাম্।
নমঃ নমঃ শ্রীগুরু পাদুকাভ্যাম।।

রাজচ্ছত্রছায়ায় সারস্বত সাধনা

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ককে শুধু এক হাজার গরু দান করেই বিদেহসম্রাট জনক ক্ষান্ত হননি, সবিনয়ে তাঁকে জানিয়ে ছিলেন -- 'আমি আপনাকে এই বিদেহ রাজ্য এবং তার সঙ্গে আমাকেও দান করছি আপনার দাসকর্মের জন্য।' গুণীর প্রতি সম্রাটের এই শ্রদ্ধা আমাদের অভিভূত করে। সেকালের বহু জ্ঞানীগুণী রাজা বা জমিদার কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়েছেন। বিশেষ ক'রে যাঁরা কবি তাঁদের প্রতি অনেক রাজামহারাজারই ছিল বিস্ময়কর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। অনেক রাজা কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং রাজচ্ছত্রছায়ায় বহু কবিই করে গিয়েছেন নিরলস সারস্বত-সাধনা।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্পদের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর সেরা সম্পদ তাঁর রাজসভা আলো করা নবরত্ন - যার মধ্যমণি মহাকবি কালিদাস ছিলেন বলে কথিত। কালিদাস-পূর্ব যুগের খ্যাতিমান 'উত্তররামচরিতের'র অমর স্রষ্টা ভবভূতি কান্যকুব্জ রাজ যশোবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধিও পান। হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভা অলংকৃত করেন ময়ূরমাতঙ্গ, দিবাকর প্রভৃতি কবি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বাণভট্ট। হরিকেলরাজ ত্রৈলোক্য চন্দ্রের সভাকবি তাঁর 'চন্দ্রচূড়চরিত' রচনার জন্য রাজার কাছ থেকে পুরস্কার হিসাবে প্রচুর ধন সম্পত্তি পান।

কাব্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজা লক্ষ্মণ সেন বোধ হয় সবচেয়ে স্মরণীয়। তাঁর রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন অবিস্মরণীয় কবি-পঞ্চক -- ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন, শরণ এবং জয়দেব। 'পবনদূত' কাব্যের স্রষ্টা ধোয়ীর সম্বর্ধনা অভূতপূর্ব। ভক্তরা ঘিরে রয়েছে। চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুসজ্জিত হাতি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন গুণমুগ্ধ রাজা -- হাতে তাঁর জলভরা সোনার ঘড়া। কবিকে তিনি 'কনকস্নান' করিয়ে দিলেন। তারপর এলো দানের পালা। রাজা কবিকে উপহার দিলেন সেকালের রীতি অনুযায়ী হাতি, ঘোড়া, সোনা মোড়া ছাতা, সোনার চামর ও নানারকম অলংকার। কবিরাজ চক্রবর্ত্তীরূপে রাজা লক্ষ্মণ সেন এইভাবেই সম্বর্দ্ধিত করেন ধোয়ীকে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রও অনেকটা এইভাবেই কবি গোদাবর মিশ্রকে অভিনন্দিত করেন।

গৌড়েশ্বরের রাজসভায় ফুলিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোক পড়ায় রাজা তাঁকে খুশি হয়ে উপহার দেন ফুলের মালা আর পাটের পাছড়া। সভাসদ কেদার খাঁ

তাঁর মাথায় চন্দন জল ছিটিয়ে কবিকে শ্রদ্ধা জানান। কবির সেদিন অলভ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু কৃত্তিবাস সবিনয়ে জানান — 'কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার। যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার।'

তুর্কী আক্রমণের পর বহুকাল বাঙ্গালীর সারস্বত চর্চায় ভাঁটা পড়েছিল। রাজসভা গুলিও হয়ে পড়েছিল চাকচিক্যহীন। সুলতান হুসেন শাহের সময় থেকে আবার শুরু হল বাণীর আরাধনা। ভাবলে অবাক লাগে মক্কার আরব সন্তান হুসেন শাহ এবং তাঁর ছেলে নুসরৎ শাহ বাংলা সাহিত্যকে রীতিমত ভালোবেসেছিলেন! এমনকি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁও ছিলেন কাব্যোৎসাহী। তাঁর নির্দেশেই পরমেশ্বর দাস প্রথম বাংলায় মহাভারত রচনা করেন। পরাগলের ছেলে ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী লেখেন অশ্বমেধপর্ব।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের প্রখ্যাত কবি মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'গুণরাজখান' উপাধি পান — 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান'।

মহাকবি বিদ্যাপতির নাম মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত। তিনি কামেশ্বর বংশের কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, বীরসিংহ, ভৈরব সিংহ প্রভৃতি রাজা ও রাণী বিশ্বাসদেবীর সহায়তা পান। রাজারা এই শ্রদ্ধেয় কবিকে বিসাপী গ্রাম উপহার দেন এবং তিনি 'অভিনব জয়দেব' সম্মানে ভূষিত হন।

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কুচবিহার রাজসভার ভূমিকা শ্রদ্ধার সহেগ স্মরণীয়। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং কবি ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে রামায়ণ লেখা শুরু হয়। গোবিন্দ কবিশেখরের মহাভারতের 'কিরাতপর্ব' এবং দ্বিজ শ্রীনাথের 'মহাভারত' লেখা কি আদৌ সম্ভব হত যদি রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণ ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ না করতেন?

কামতা-কামরূপের রাজা বিশ্বসিংহ এবং নরনারায়ণ, সমর সিংহ, শুক্লধ্বজ প্রভৃতি তাঁর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন কাব্যোৎসাহী। পুরাণকথার বঙ্গানুবাদ প্রসারে ঐ রাজসভার ভূমিকা ছিল অসামান্য। সমর সিংহের নির্দেশে কবি পীতাম্বর বাংলায় লেখেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী। 'রাম সরস্বতী' উপাধিধারী অনিরুদ্ধকে শুক্লধ্বজ শুধু 'ভারত পয়ার' লিখতে অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হননি, কবিকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে যত মহাভারতের পুঁথি ছিল, সব পাঠিয়েছিলেন এবং সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ভরণপোষণের সমস্ত ভার।

নিঃস্ব কবি মুকুন্দরামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায়। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুকুন্দরামের ছাত্র রঘুনাথ রাজা হন। তাঁরই উৎসাহে মুকুন্দরাম রচনা করেন বাংলা কাব্যের ইতিহাসে স্মরণীয় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য।

তিনি 'কবিকঙ্কন' উপাধি পান এবং সম্বর্দ্ধিত হন।

সাঁতোলির রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন কাব্যরসিক। তাঁর সভাকবি ছিলেন রামায়ণ রচয়িতা নিত্যানন্দ অদ্ভুদাচার্য। গোপভূমের রাজা গণেশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত কবি রূপরাম লেখেন তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ এবং তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহের ঐকান্তিক ইচ্ছায় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী সৃষ্টি করে তাঁর প্রখ্যাত কাব্য 'শিব সংকীর্তন'।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রোসাঙ্ রাজসভার দান অবিস্মরণীয়। দৌলত কাজী এবং আলাওলের মতো দুই শক্তিমান মুসলমান কবির নাম এই রাজবংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রানী' রচিত হয় রাজা শ্রীসুধর্মার সেনাপতি আশ্রফ খানের অনুরোধে। কবিকে তিনি বাংলায় পাঞ্চালীর ছন্দে সকলের বোধগম্য ক'রে ঐ কাব্যটি লিখতে অনুরোধ করেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত মহাকবি আলাওল রোসাঙের রাজসভায় পণ্ডিত মগন ঠাকুরের স্নেহছায়া লাভ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে সৃষ্টি হয় কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী'। 'সয়ফুলমুলক বদি উজ্জমাল'-ও মগন ঠাকুরের অনুরোধ কবি লিখতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে মগন ঠাকুরের মৃত্যু হয় এবং কাব্যটি অসমাপ্ত থাকে। অনেকদিন পরে শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান অমাত্য সৈয়দ মুসার অনুরোধে আলাওল অসমাপ্ত কাব্যটি শেষ করেন। যাঁর সভায় 'গুণিগণ অবিরত। জ্ঞান ভক্তি রস কথা সুনন্ত সতত' -- তিনি হলেন মন্ত্রী সোলেমান। তাঁরই একান্ত ইচ্ছায় আলাওল দৌলত কাজীর এক অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন। তাঁর 'হপ্তপয়কর' এবং সিকান্দারনামা' কাব্য দুটি লেখা হয় সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ এবং রাজা চন্দ্র সুধর্মার অনুরোধে।

কবি-প্রতিপালক রাজা হিসাবে নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র রায় ছিলেন বিখ্যাত। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার প্রমুখ বিখ্যাত কবি তাঁর সভা অলংকৃত করেন। রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র লেখেন তাঁর কালজয়ী কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'। রাজা তাঁকে মাসিক বৃত্তি ও জমি দান করেন। তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধিও পান রাজার কাছ থেকে। সাধক-কবি রামপ্রসাদও রাজার কাছ থেকে একশো বিঘে জমি ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি পান। বাণেশ্বর বিদ্যালংকার কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার এক প্রধান সভাসদ ছিলেন। সভায় যখনই তিনি প্রবেশ করতেন, তখনই রাজা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখাতেন। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাণেশ্বরকে কলকাতায় একটি বাড়ি উপহার দিয়ে স্বয়ং বাধিত হন। বলা বাহুল্য, রাজচ্ছত্রছায়ায় লালিত অনেক কবিই রাজাদের স্তুতি করে তাঁদের মনোরঞ্জন করেছেন। অনেকের কাব্যে 'রাজসভার দোষ'ও সুস্পষ্ট। কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টি করেছেন এমন কবির সংখ্যাও অল্প নয়। তাই রাজচ্ছত্রছায়ায় বাঙালী কবিদের সারস্বত সাধনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।
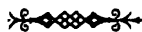
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন

পৃথিবীর অনেক নাম -- বসুমতী, বসুন্ধরা, ভূলোক, ধরিত্রী, মেদিনী, ভুবন -- আরো কত কি! আরো একটি নামে পৃথিবীকে এখন অভিহিত করা চলে। নামটি হল 'যুদ্ধ শিবির'। বলাই বাহুল্য যে আজকের এই পৃথিবী সত্যিই বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি ভয়ংকর যুদ্ধ শিবির। অর্থ, অস্ত্র আর ক্ষমতার দম্ভে স্ফীত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বিশ্বকে ধ্বংস করবার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ, সংঘর্ষ আর পারস্পরিক উত্তেজনার খবর ছাড়া আজ যেন সংবাদপত্র অচল। আতঙ্কগ্রস্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ ভাবছে, এই বুঝি শুরু হলো রক্তক্ষয়ী মহাসমর!

'ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থতা আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। যুদ্ধের হুমকি, সাম্রাজ্যলোভী শক্তির জান্তব লোভ, দাঙ্গা, হানাহানি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মস্থানকে খুনের আখড়ায় পরিণত করা, বিচ্ছিন্নতাবাদ -- দেশে দেশে -- বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথা চাড়া দিচ্ছে। অশুভ শক্তির চক্রান্তে শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী! অহিংসা, প্রেম ক্ষমা -- সত্য, শিব, সুন্দর এই সুন্দর শব্দগুলি আজ যেন কেবল বাংলা অভিধানেই পাওয়া যায়! কবি জীবনানন্দ দাশের কণ্ঠে যথার্থই উচ্চারিত হয়েছে মন্ত্রের মতো অমোঘ একটি অবিস্মরণীয় পংক্তি -- 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।'

'দয়াহীন সংসারে' 'যুগে যুগে দূত' পাঠিয়েছেন ভগবান। তাঁরা সকলেই মানব

সমাজকে শুনিয়েছেন ক্ষমা, প্রেম ও অহিংসার বাণী। হিংসায় উন্মত্ত মানুষকেও তাঁরা ভালোবেসে উপদেশ দিয়েছেন -- 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।' প্রাচীনযুগের ঋষি দেখিয়েছেন পথের ঠিকানা -- 'অসতো মাসদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' অর্থাৎ 'অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে নিয়ে যাও আলোয়। মৃত্যু থেকে আমাকে নিয়ে যাও অমৃতে।' রামায়ণের রামচন্দ্র বলেছেন, 'সত্যপালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম'। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে শুনেছি শ্রীকৃষ্ণের বজ্র নিনাদ -- 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ' -- আমাদের জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে যাক সবরকম দুর্বলতা। বিশ্বের কল্যাণ কামনায় বুদ্ধদেব উচ্চারণ করেছিলেন, সকল প্রাণী যেন সুখী ও শত্রুহীন হয়, চিরদিন যেন অন্তর মাঝে অহিংসা জাগ্রত থাকে। মানবসত্যের বেদীমূলে প্রাণ উৎসর্গ করার আগেও যীশু বলে গিয়েছিলেন -- 'শত্রুকেও ভালোবাসবে। প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে নিজের মতো ভেবে।' হজরত মোহাম্মদ শিক্ষা দিয়েছেন -- 'মানুষের সেবাই আল্লার সেবা।' সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য শংকর বলেছিলেন -- 'সর্বদা জীবগণের হিতসাধন।' গুরু নানককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? উত্তর দিয়েছিলেন মহান শিখ গুরু -- 'আমি সেই এক ঈশ্বরের পূজারী। তাঁকে আমি দেখি মর্ত্যের ধূলিতে, ঊর্ধ আকাশে ও সকল দিকে।' আর শ্রীরামকৃষ্ণের বীর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জনগণকে আশীর্বাদ করেছিলেন -- 'শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর 'পরহিতায়' জীবনপাত কর।'

এইসব উপদেশ মানুষ শুনেছে। মানুষ এই মহাপুরুষদের উদ্দেশে অর্পণ করেছে শ্রদ্ধার্ঘ্য। কিন্তু তবু জগৎ থেকে নির্মূল হয়নি হিংসা। মহান রুশ লেখক আন্তন চেখভের সেই স্বপ্ন, 'সমস্ত পৃথিবী একদিন সাজানো ফুলের বাগান হয়ে উঠবে' -- স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ সারছে না। বহুদিন ধরে সে ভুগছে। কে সারাবে? কোথায় সেই 'বৈদ্য'?

'সূর্যের' ভূমিকা আমরা পালন করতে না পারি, কিন্তু আমরা কি হতে পারি না সেই 'মাটির প্রদীপ', অস্তগামী সূর্যকে যে বলেছিল 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি?' রামচন্দ্রের মতো আমরা সেতুবন্ধন করতে না পারি, কিন্তু আমরা কি পারিনা সেই 'কাঠবিড়ালী' হতে? একদা সর্ব ব্যাপারে অগ্রণী ভারত কি পারবে না অসুস্থ পৃথিবীর রোগ নির্ণয় করতে?

পৃথিবীর এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের দূর করতেই হবে। অর্থ দিয়ে নয়, অস্ত্র দিয়েও নয় -- দেশের শ্রেষ্ঠতম মনীষী ও ধর্মগুরুদের অজর অমর শিক্ষা এবং ভারতের সনাতন ধর্মের সুমহান আদর্শ হয়তো পারে রোগাক্রান্ত ধরণীকে সুস্থ সবল ক'রে তুলতে।

মানব সভ্যতার সেই প্রভাতে যখন [illegible] ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মের নামে রক্ত ঝরাচ্ছে, তখন ভারতের শান্ত তপোবন থেকে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অপূর্ব পথনির্দেশ --'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। 'মা হিংসী', হিংসা কোরো না। কেনা জানে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশান্তির মূল উৎস লোভ ও হিংসা। অসুস্থ পৃথিবীর রোগ নিরাময়ের এটি একটি মোক্ষম দাওয়াই, সন্দেহ নেই।

সর্বভূতে সমদর্শন, সর্বভূতে প্রীতি ও সর্বভূতে সেবার যে মহান আদর্শ আমাদের সত্যানুসন্ধানী ঋষিরা প্রচার করেছিলেন, বিশ্ববাসী যদি এই অবক্ষয়ের যুগে তা গ্রহণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। আমাদের ঋষিরাই প্রথম প্রচার করেছিলেন বিশ্বমৈত্রীর বাণী -- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ 'সারা বিশ্বই আত্মীয়'। বিশ্বশান্তির পক্ষে আমরা কি ঐ মহাবাণী কাজে লাগাতে পারি না? আজ যদি আনবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং গর্বোদ্ধত কোনো রাষ্ট্র ভারত থেকে ঋণ নিয়ে উচ্চারণ করে এবং একান্তভাবে চায় ঋষি উচ্চারিত সেই অবিস্মরণীয় বাণী 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' -- 'সকলে সুখী হোক', তাহলে সেই রাষ্ট্র কি পারবে দুর্বল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে? এই একটি মন্ত্রোচ্চারণই কি পৃথিবীর গভীরতর অসুখ সারাতে পারে না? বালক ধ্রুবকে ব্রহ্মা বর দিতে চাইলে, ধ্রুব যা বলেছিলেন, তা যদি বিশ্বের সকলেই মনেপ্রাণে চায়, তাহলেও রোগার্ত ধরিত্রী নিঃসন্দেহে রোগমুক্ত হতে পারবে। ধ্রুব বলেছিলেন -- 'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য' অর্থাৎ বিশ্বের স্বস্তি হোক।

বিশ্বের দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্তির যাবতীয় ওষুধই আছে ভারতবর্ষে। কিন্তু 'বৈদ্য'র ভূমিকা পালন করবেন কে? এর দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। হতাশ হলে চলবে না, মনে রাখতে হবে বিশ্বশান্তির মহান দূত রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী --

'শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।'

বুকের মধ্যে ক্ষত, হাতে রক্ত গোলাপ, মুখে হাসি।

স্বপ্ন দেখছেন সেই ফরাসী মহিলা।

এক আশ্চর্য স্বপ্ন, এক অভূতপূর্ব দিব্যদর্শন! মহিলাটি রোগ যন্ত্রণায় কাতর। কী দুঃসহ সেই রাত! কিন্তু একি! কে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে? কে ঐ স্মিতানন, জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ?

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও বুঝতে পারেন ঐ বিদেশিনী -- আবির্ভূত পুরুষসিংহটি প্রাচ্যের সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর হাতে রক্তপদ্ম, তিনি হাসছেন আর সেই হাসিতে যেন ঝলসে যাচ্ছেন যন্ত্রণাকাতর মহিলাটি। 'আমার এত কষ্ট আর আপনি হাসছেন?' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখতে পেলেন স্বামীজীর বুকের মাঝখানে এক ক্ষতচিহ্ন, আর সেইখান থেকে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্তস্রোত! তবু তিনি হাসছেন হাতে রক্তপদ্ম নিয়ে। আশ্চর্য জ্যোতি আর প্রশান্তি সারা মুখে, বলছেন -- দ্যাখো, জীবনে দুঃখ কষ্ট আছে, তবু আমাদের হাসতে হবে, বাঁচতে হবে।

ফরাসী মহিলার স্বপ্নে দেখা বিবেকানন্দ যন্ত্রণাদীর্ণ মহিলাকে শোনাননি বৈরাগ্যের মন্ত্র, সান্ত্বনা বাণী কিংবা শাস্ত্রবচন। তাঁর কণ্ঠে দুঃখজয়ের আহ্বান, আনন্দের মধ্যে বেঁচে থাকার সঞ্জীবনীমন্ত্র। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন -- 'দুঃখ জানে, শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।'

অনেক কষ্ট পেয়েছেন স্বামীজী। মানুষের দুঃখ, দেশের দুর্দশা এই মানবতাবাদী মহাপ্রাণকে বিচলিত করত যা হয়তো 'শাস্ত্র সম্মত' নয়। কেননা সাধুরা নাকি সুখে দুঃখে উদাসীন থাকেন। আমাদের সৌভাগ্য বিবেকানন্দ অন্ততঃ ঐ অনুশাসনটি অগ্রাহ্য করেছেন।

একবার স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থ হবার পর শরীর সারাতে দার্জিলিং গিয়েছেন। হঠাৎ খবর এল -- কলকাতা মহানগরী প্লেগে আক্রান্ত! বিচলিত মহামানব সঙ্গে সঙ্গে

ফিরে এলেন কলকাতায়। আর্তের সেবা করতে হবে, দাঁড়াতে হবে বিপন্ন মানুষের পাশে। কিন্তু অর্থ কোথায়? কোথা থেকে জুটবে ওষুধ আর পথ্যের খরচ? গুরুভাইদের বললেন — 'মঠের জন্যে যে জমি কেনা হয়েছে, সেটা বিক্রি করেও যদি হাজার হাজার রোগার্তের প্রাণ বাচাতে পারি, তবে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।'

আমেরিকায় এক ধনকুবেরের প্রাসাদে একবার স্বামীজী আশ্রয় নিয়েছিলেন। আরাম বিলাসের সে কি উপকরণ! স্বামীজী শুয়ে আছেন দুধসাদা আরাম শয্যায়। বাইরে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। বরফ পড়ছে, আর ঘরে কি মধুর উষ্ণতা! কিন্তু হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠলেন স্বামীজী। তাঁর মনে পড়ল, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই, ক্ষুধার আগুনে তাদের পেট জ্বলছে আর তিনি শুয়ে রয়েছেন এই সুখস্বর্গে! বিছানা ত্যাগ করে ভূমি শয্যায় শয়ন করলেন তিনি। দু'চোখে অবিরাম অশ্রুধারা, কণ্ঠে কেবল এক প্রেমঘন উচ্চারণ — 'আমার দেশ! আমার দেশ!'

রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন — 'বিশ্বমানবের সকল দুঃখ যন্ত্রণার আঘাত এসে শিশুর মতো তাঁর কোমল ত্বকে অবিরাম অজস্র ক্ষত সৃষ্টি করত। ... বিশ্বের সকল মানুষের দুঃখ বেদনা নিজের বিশাল হৃদয়ে অনুভব করতেন।'

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কম দুঃখ পাননি। পিতার মৃত্যুর পর অশৌচ অবস্থাতেও তিনি 'অনাহারে, ছিন্নবস্ত্রে নগ্নপদে চাকরীর আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অফিস হইতে অফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।' স্বামীজী নিজেই বলছেন ঐ সময়ের অবস্থা, 'এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম।' দু'একজন বন্ধু সঙ্গে ছিল বা ঘটনাক্রমে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের একজন স্বামীজীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একটা গান গেয়েছিল — 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে।' স্বামীজী গায়ক বন্ধুকে গান থামাতে বলে গর্জন করে উঠলেন — 'ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানা পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকট ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে ..... কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

বাড়িতে যেদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হত না সেদিন ভুবনেশ্বরীদেবীকে 'নেমন্তন্ন আছে' বলে বেরিয়ে যেতেন স্বামীজী এবং সামান্য কিছু খেয়ে বা অনশনে সারা দিন কাটিয়ে দিতেন। বন্ধুদের অনুরোধে গান গেয়ে তাদের মনোরঞ্জন করতে হত। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও স্বামীজী অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে অশেষ কষ্ট করেছেন, অন্নের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পর্যন্ত করেছেন। খ্রীষ্টান সমাজ তাঁকে কম আক্রমণ

করেনি। নানাভাবে তাঁর নামে তারা কুৎসা রটনা করেছে। স্বদেশেও তাঁকে অনেক নিন্দা ও কুৎসিত সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল।

অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা বিবেকানন্দ পেয়েছেন, তবু তিনি, 'বুকের মধ্যে ক্ষত'কে উপেক্ষা করে রক্তপদ্মের সৌরভ ছড়িয়েছেন আর হেসেছেন, রঙ্গ-তামাশা করেছেন। অসামান্য ছিল তাঁর মার্জিত রসবোধ। হেল ভগিনীদের লেখা এক পত্রে তিনি লিখছেন -- 'আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন দেখি তোমরা চারজন গরমে ভাজা, পোড়া, সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণে বেড়ে যায়।' অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁর চুল পাকতে শুরু করেছিল। সে প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন -- 'তোমার সঙ্গে পরবর্ত্তী সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মাথাটি পূর্ণ বিকশিত একটি শ্বেতপদ্মের মতো হবে।'

'স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন -- 'কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্প গুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম।' স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত 'স্বামি শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে তাঁর কৌতুক প্রিয়তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পত্রাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে বিবেকানন্দ ছিলেন যথার্থই রসরাজ। স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে তিনি একদিন অপূর্ব এক কাহিনী শোনান। গঙ্গাহীন দেশে কলকাতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ি যায়। তাঁর খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল সব হাজির। শাশুড়ী জামাইকে বললেন, আগে একটু দুধ খাও। যেই বাটিতে সে চুমুক দিল অমনি চারদিক থেকে ঢাকঢোল বেজে উঠল। শাশুড়ী আনন্দে কাঁদো কাঁদো হয়ে জামাই -এর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, 'বাবা, তুমি আজ ছেলের কাজ করলে। তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের হাড়গুঁড়ো। শ্বশুর গঙ্গা লাভ করলেন।' একবার গোরক্ষিণী সভার এক প্রচারক স্বামীজীকে বললেন, গরু আমাদের মা। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর রঙ্গ ও বিদ্রূপ -- গরু যে মা তা আমি বুঝেছি। তা না হলে এমন কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবে!

ভক্ত শিষ্যদের স্মৃতিচারণায় এবং তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার অজস্র নিদর্শন।

দুঃখ কষ্ট অপমান জ্বালা সহ্য করেও মানুষকে আনন্দ দিয়ে গেছেন তিনি। আজ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই জটিলতা বাড়ছে। প্রায় প্রতিটি মানুষ নানা সমস্যায় ক্রুসবিদ্ধ। মানুষের সর্বাঙ্গ আজ যেন রক্তাক্ত। তবু হাতে তুলে নিতে হবে রক্তপদ্ম, বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে। নিজে বাঁচবো, অপরকেও বাঁচাবো। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে সেই কল্যাণী ইচ্ছা -- 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু', 'সর্ব সর্বত্র নন্দতু।'

হৃদয়ারবিন্দ শ্রীঅরবিন্দ

'হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয়বাণী
উদার মৃত্যুর।' —— রবীন্দ্রনাথ

ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, হলেন শ্রীঅরবিন্দ। ছিলেন দেশের বিপ্লব আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম মহানায়ক, হলেন যোগবরিষ্ঠ মহাযোগী। ছিলেন নমস্য, হলেন প্রণম্য।

ভগবদ্দর্শনের প্রেরণা তাঁর মধ্যে কমবেশি বরাবরই ছিল। স্ত্রী মৃণালিনীদেবীকে এক পত্রে তাঁর যে তিনটি 'পাগলামি'র কথা তিনি লিখেছিলেন, তার একটি ঈশ্বরলাভের তীব্র আস্পৃহা -- 'যে কোন মতে ভগবানের দর্শনলাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সেই পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি।' বরোদায় থাকাকালীন তিনি দিনে পাঁচ ছ' ঘন্টা করে প্রাণায়াম করতেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরুদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দ নর্মদার তীরে থাকতেন। অরবিন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বরোদাতে বিষ্ণুভাস্কর লেলে নামে মারাঠী যোগীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর কাছ থেকেই অরবিন্দ যোগাভ্যাসের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ দিলীপকুমার রায়কে বলেন -- 'মনকে শান্ত করো', লেলে তাঁকে বলেছিলেন, 'চিন্তার দিকে একদম ঝুঁকো না; তাহলে ক্রমশঃ দেখতে পাবে যে সব চিন্তাকে তুমি তোমার নিজের বলে মনে করে এসেছ, সে সব আসে বাইরে থেকে। যেই তাদের আসতে দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়াতে হবে। এইভাবে কিছুকাল অভ্যাস করলেই মনের মধ্যে নেমে আসবে স্থিরতা ও প্রশান্তি।' অরবিন্দ তাঁর উপদেশ মেনে ছিলেন। লেলের শিক্ষায় ঠিক তিন দিনে তিনি সবরকম চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যোগ সাধনার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে গেল কারাগারের অন্ধকূপে।

অরবিন্দ তখন দেশের মুক্তি আন্দোলনের 'জনগণ-মন-অধিনায়ক', প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বঙ্গদেশ তখন উত্তাল। অরবিন্দ জাতিকে সশস্ত্র বিপ্লব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। গুপ্ত সমিতি গঠন করে সর্বত্যাগী যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। লিখে চললেন অসাধারণ উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ। অকুতোভয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপে কেঁপে উঠল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্ত ইমারত। পুলিশ বোমা তৈরীর প্রধান কেন্দ্র মানিক তলায় মুরারিপুকুর বাগানের সন্ধান পেল। গ্রেপ্তার বরণ করলেন বহু বিপ্লবী। গোয়েন্দা পুলিশ অরবিন্দের বাড়ীতে হানা দিয়ে খানাতল্লাসী চালাতে লাগল। একটা ছোট বাক্সের মধ্যে ছিল দক্ষিণেশ্বরের মাটি। অরবিন্দ এ প্রসঙ্গে লেখেন – 'ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ।' এরপরেই অরবিন্দের ব্যঞ্জনাগর্ভ মন্তব্য স্মরণীয় – 'এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না।' পরে অবশ্য সাহেব বুঝতে পারেন ঐ বস্তুটি নিছক মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হল, আটকে রাখা হল প্রেসিডেন্সি জেলের ছোট্ট একটি ঘরে। ঘরটি ছিল ন ফুট লম্বা আর পাঁচ ফুট চওড়া। জানলা বিহীন ঐ ঘরটির সামনে ছিল বিশাল লোহার গরাদ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটি পরবর্ত্তীকালে মহাতীর্থ হয়ে ওঠে। এখানেই তিনি বাসুদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কারাগারের অন্ধকূপে, নির্জনতার মধ্যে তিনি গুরু ও সখারূপে বাসুদেবকে পেলেন। তিনি লেখেন – 'বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কোপ দৃষ্টির একমাত্র ফল আমি বাসুদেবকে পাইলাম।'

আলিপুর আদালতে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন দেশবরেণ্য ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। বিচারপতিকে সম্বোধন করে তিনি সেদিন অরবিন্দ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, 'Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands.' সংক্ষেপে এর অর্থ হল – এই বিতর্ক, আন্দোলন স্তব্ধ হবার দীর্ঘকাল পরে, তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে মানুষ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি, মানবপ্রেমিক এবং জাতীয়তার নবী বলে শ্রদ্ধা করবে, তাঁর বাণী সাগর পারের দূর দূরান্তে ধ্বনিত হবে।

পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, দেশবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী কত অভ্রান্ত!

প্রেসিডেন্সী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের অন্যতম ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁরা কেউ মাথায় মাখবার তেল পাচ্ছেন না অথচ অরবিন্দের চুল কিভাবে তেল চকচকে থাকে? এই প্রশ্ন নিয়ে একদিন তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। অরবিন্দ বললেন — 'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর থেকে চুল ফ্যাট টেনে নেয়।' উপেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন, 'অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে। তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেখমাত্র নাই। .... এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দবাবু বলিলেন যে একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান।'

এইসব যাবতীয় জড় পদার্থ তাঁর কাছে চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। বিচারক, উকিল, বন্দী আসামী সকলের মধ্যে তিনি বাসুদেবকে দেখতে পেতেন। 'তারপর তিনি (বাসুদেব) আমার হাতে গীতা দিলেন,' উত্তরপাড়া অভিভাষণে তাঁর স্বীকারোক্তি, 'তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম।' তাঁকে যখন তাঁর ছোট্ট ঘর থেকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হল, তখন তিনি দেখলেন তিনি আর উঁচু দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নন। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।

সাক্ষাৎ বাসুদেব দর্শন হবার পরেও, বিশ্বজনের কল্যাণের জন্য শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘকাল কঠোর যোগ সাধনায় ব্যাপৃত থেকে সিদ্ধিলাভ করে জ্যোতির্ময় দিব্য মানবে পরিণত হন। ১৯২৮ সালে তাঁকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন — 'আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। .... অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। ..... মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন ঃ 'যুক্তাত্মান ঃ সর্বমেবাবিশন্তি। ... আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে ঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে।'

শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। তাঁর 'বেদরহস্য', 'উপনিষদষ্টক', 'দিব্যজীবন', 'যোগসমন্বয়', 'মানব বর্তনি', 'বিশ্ব এক নীড়' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'সাবিত্রী' মহাকাব্য কালজয়ী।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগের নাম দিয়েছেন 'পূর্ণযোগ'। আমাদের সমগ্র সত্তায় ঈশ্বরের আনন্দময় রূপের প্রতিষ্ঠাই এই যোগের অভিষ্ট। তাঁর ধারণায় মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, মানব স্বরূপকে দিব্যজ্ঞানে এবং মানব

আনন্দকে দিব্যানন্দে উন্নীত করা, ঈশ্বরের দিব্যরাজ্যকে এই ধূলার ধরণীতে নামিয়ে আনা। এ প্রসঙ্গে হিমাংশু নিয়োগী বলেছেন -- 'শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের যোগ সাধনা এক শক্তিসঞ্চারী বেগ নিয়ে মানুষের অন্তশ্চেতনার রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। আমাদের সাধারণ দৃষ্টি যা দেখতে পায়না সেই আধ্যাত্মিক নেপথ্যলোকে ঘটে গেছে এক বিরাট বিপ্লব। জগতের উপর পরমাশক্তির -- অতিমানসের জ্যোতির আবির্ভাব হল তার তারণ স্পর্শ নিয়ে।'

দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে শ্রীঅরবিন্দ জানান যে অতিমানস শক্তিকে তিনি নামিয়ে আনতে চাইছেন স্বমহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে নয়। 'আমি চাই এক আন্তর সত্য, আলো, সুষমা ও শান্তির নীতিকে পার্থিব চেতনার রাজ্যে আবাহন করতে। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি উপরে .... আমার চেতনার উর্দ্ধ হতে তার জ্যোতিঃপ্রপাত হচ্ছে আমি প্রত্যক্ষ করছি। আমি চাই যাতে করে আমাদের সমগ্র সত্তাকে সে তুলে নিতে পারে তার স্বকীয় শক্তিস্বরূপের মধ্যে, অন্যথা মানুষের স্বভাব চলতে থাকবে আধ-আলো-আধ-ছায়ার সনাতন ভূমিকায়। আমি এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছি যে এই সত্যের অবতরণ হলে জগতে খুলে যাবে এক দিব্য চেতনার বিকাশের পথ আর পার্থিব বিবর্তনের, সেই হবে পরম নিহিতার্থ।'

শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫০ সালে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের কয়েকদিন পরেও তাঁর দিব্য দেহের কোনো বিকৃতি হয়নি। এতটুকু কমেনি তাঁর দেহের দিব্য আভা, অপার্থিব দিব্য জ্যোতি। এমনটি বোধহয় আর কখনও দেখা যায়নি।

এই দিব্য মানব সম্পর্কে শ্রীমায়ের (মাদার) স্মরণসুন্দর বিশ্লেষণ -- 'শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর কাছে এতখানি উদার হস্তে এনে দিয়েছেন যত আলো আর জ্ঞান আর শক্তি, তারজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর শিক্ষা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা আর তা কার্যে পরিণত করা।

'তাঁর শিক্ষা আমাদের যেন অন্ধকার দূর করে পথ দেখিয়ে চলে।'

সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি

কত দেশের কত সংস্কৃতি আজ ধূলায় বিলীন, ইতিহাসের ধূসর স্মৃতি। কিন্তু হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে মৃত্যুহীন মহিমায় ভারতীয় সংস্কৃতি আজও অম্লান। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগসর্বস্বতা, অর্থ ও শক্তির দম্ভ এবং পরমত অসহিষ্ণুতা বিশ্ববাসীকে শান্তির পথ দেখাতে এবং মানুষে মানুষে প্রেম ও মৈত্রীর রাখী পরাতে পারেনি। অথচ কত শত অত্যাচার সহ্য করেও এই সংস্কৃতি যে আজও তার বর্ণবৈভব ও মহিমা হারায়নি, তার কারণ সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছে মানবতার জয়গান, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর উদাত্ত বাণী। মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ যখন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও দেবদেবীদের প্রকৃতি নিয়ে বিবদমান, তখন ভারতের তপোবন থেকে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ ব্রহ্ম এক, ঋষিরা নানাভাবে বলে থাকেন। পাশ্চাত্য জগৎ যখন অস্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম প্রচার করতে বেরিয়েছে, তখনও মুনি ঋষিরা উচ্চারণ করেছেন ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির সুমহান আদর্শ -'মা হিংসী, মা গৃধঃ' অর্থাৎ হিংসা কোরো না, লোভ কোরো না। তাঁরা পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছেন সনাতন ধর্মের অবিনাশী মন্ত্র – 'সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্' অর্থাৎ সকল স্থানে সকলের মধ্যেই ঈশ্বর বর্তমান। পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের প্রতিটি দেশের সংস্কৃতি ও ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, সবার মধ্যে জাগিয়েছে এক অখণ্ডবোধের চেতনা। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' – এই ঋষি বাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বপ্রেমের সর্বোত্তম বাণী।

জার্মান মনীষী ম্যাক্সমুলার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন -- 'যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে পৃথিবীর কোন দেশের আকাশের নিচে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবগুলি সঞ্চয় করেছে -- তাহলে আমি ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দেব। যদি আমরা পূর্ণতর মানবজীবন পেতে চাই - কেবলমাত্র ইহকালের জন্য নয়, অনন্ত জীবনের জন্য, তাহলে আমি আবার ঐ ভারতবর্ষের দিকে

দৃষ্টি ফেরাব।' পাশ্চাত্য ভারতবিদের এই সপ্রশংস মন্তব্যের জন্য আমরা সঙ্গত কারণেই গর্ব অনুভব করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জার্মান ভারতবন্ধু পৃথিবীর এত দেশ থাকতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষের ভীড়ে পর্যুদস্ত পরাধীন ভারতবর্ষের নাম করলেন কেন? কেনইবা এই মান্ধাতাগন্ধী দেশের প্রতি ম্যাক্সমুলার সাহেবের এত গভীর শ্রদ্ধা?

এর কারণ ম্যাক্সমুলার ভারতবর্ষের গতিশীল সনাতন ধর্ম আর সংস্কৃতির মধ্যেই ভারতাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন। বাস্তবিক, পৃথিবীর আর কোন দেশ এত উচ্চ কণ্ঠে মানবতা আর মহামিলনের মহাসঙ্গীত গেয়েছে? কোন্ দেশ ভারতবর্ষের মতো সত্য-শিব-সুন্দর আর শান্তম - শিবম - অদ্বৈতমের পূজারী হিসাবে দেশে দেশে নন্দিত হয়েছে? ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশ সেই প্রাচীনকালেই দুন্দুভিনাদের মতো শুনিয়েছে বিশ্ব মানসের মর্মকথা — 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু'?

কোনও দেশই নয়। তাই দরিদ্র ভারতবর্ষের আত্মিক ঐশ্বর্য যুগে যুগে দূরের মানুষকে কাছে টেনেছে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' সমবেত হয়েছেন নানা ধর্মের নানা বর্ণের মানুষ। সব দেশের সব মানুষকেই এই দেশ আপন বলে বরণ করে আসছে। বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম আর উদার মানবতাবাদ ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে ঋণ নেয়নি। এইসব গুণাবলীর উৎস ভারতবর্ষ। পুরাণে আছে, স্বয়ং ব্রহ্মা বালক ধ্রুবকে বর দিতে চাইলে তিনি বর না চেয়ে শুনিয়ে ছিলেন বিশ্বমানবতার অবিস্মরণীয় বাণী — 'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য' — বিশ্বের স্বস্তি হোক। শিবি রাজা স্বর্গরাজ্য, পুনর্জন্ম কিছু চাননি, চেয়েছিলেন আর্ত মানুষের দুঃখমুক্তি — 'কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তি নাশনম্' — অর্থাৎ দুঃখতপ্ত প্রাণীদের যন্ত্রণার অবসান হোক। মহামুনি বাল্মীকি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জয়গান — 'ন মানুষাং শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' — মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই। ঐ একই বাণী পরবর্তীকালে ধ্বনিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে — 'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই।'

বৈদিক যুগের প্রার্থনা হল — 'আমরা যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় অটুট রেখে শতাধিক বছর ভালোভাবে বেঁচে থাকি।' তৈত্তিরিয় উপনিষদে শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশ স্মর্তব্য — 'সন্তান-সন্ততি প্রজননে অবহেলা কোরো না, সম্পদ অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়ো না।' শুক্ল যজুর্বেদে প্রার্থনা করা হয়েছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের — 'দেশে যেন শক্তিশালী মানুষ, সাহসী যোদ্ধা, দুগ্ধবতী গাভী, দেবীতুল্য নারী, রুচিবান যুবক জন্মগ্রহণ করে।' অন্নের দ্বারা মনকে পোষণ করতে নিষেধ করেছেন শম্বর মুনি — 'নৈনমন্নেন বীভবঃ'। ব্রহ্মপুরাণে তাকেই প্রকৃত সাধক বলা হয়েছে যিনি পরোপকারী, 'পরার্থোদ্যতঃ সদা'। অনিমাদি অষ্ট — সিদ্ধি বা মুক্তি না চেয়ে মহাত্মা রন্তিদেব প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন সকল দেহীর দুঃখ দূর করতে পারেন।

ভারতবর্ষের ঋষি-কণ্ঠে বিশ্ব শুনেছে সেই আশ্চর্য বাণী -- 'আনন্দ হতেই জীবসমূহ জাত। জীবগণ আনন্দ দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং অন্তিমকালে আনন্দেই প্রয়াণ করে।' দুঃখ ও বিষাদের জয়গান তাঁরা করেননি। 'দ দ দ - দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম' -- দান, দয়া এবং সংযমের যে উদাত্ত ধ্বনি ভারতের তপোভূমি থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, বিখ্যাত কবি টি এস এলিয়টের জন্য সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত।

ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কেবল ধর্মকেই বোঝায় না। সাহিত্য - শিল্প সঙ্গীত, জ্ঞান-বিজ্ঞান -- সবকিছু নিয়েই এই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি অত্যন্ত উন্নত যা অনাদিকাল থেকে মানুষকে দিয়েছে উদার মানবিকতার আলো, মিটিয়েছে মনের ক্ষুধা। যেহেতু ধর্মই ভারতবর্ষের সবকিছু তাই এদেশের সংস্কৃতিও সৃষ্টি হয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে ধর্মের সার তত্ত্ব। কাব্য হিসাবেও এগুলি অতুলনীয়। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় তথা বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কাব্য সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে।

ভারতীয় স্থাপত্য, শিল্প, ভাস্কর্য অতুলনীয়। এগুলি প্রায় ছ'হাজার বছরের পুরানো। স্বামী চেতনানন্দ একটি প্রবন্ধে চমৎকার মন্তব্য করেছেন -- 'প্রাচীন মিশরীয় শিল্প ঝোঁক দিয়েছে স্থায়িত্বের দিকে, যেমন পিরামিড। রোমক শিল্পে শরীর বিজ্ঞান ও বাহ্য সৌন্দর্যের স্থান প্রকাশ পেয়েছে। আসিরীয় শিল্প রূপায়িত করেছে দৈহিক শক্তিকে জাপান ও চৈনিক শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। আর ভারতীয় শিল্প অরূপকে অপরূপ করে দিয়েছে, ভারতীয় শিল্প বিশ্ব সভ্যতার কালোত্তীর্ণ সম্পদ।

ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ভাব সম্পদ সুরবৈচিত্র, যন্ত্র সঙ্গীতের অপূর্ব প্রয়োগ, ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের অসামান্য ছন্দোময় রূপ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আজ থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর আগেও যে এদেশে শিল্প ও সঙ্গীতচর্চা হত তার প্রমান মহেনজোদারো-হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে পাওয়া যায়। ঐ দুই নগরীর প্রাসাদ, স্নানাগার, রাস্তার যে নিদর্শন আমরা পেয়েছি তাতে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

বহু মানুষের ধারণা -- ভারতবর্ষে ধর্মের দেশ, এখানে বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলি বিজ্ঞান চর্চায় অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। কিন্তু আমাদের দেশেও যে প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল, সে খবর হয়ত অনেকের অজানা। মহাবিজ্ঞানী নিউটন, গ্যালিলিও প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের বৈদিক ঋষিরা বহু বৈজ্ঞানিক সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনের কথা ঋক্‌বেদে আছে। শূন্যের আবিষ্কারের কৃতিত্ব

ভারতীয় ঋষিদের। জ্যামিতির যথেষ্ট প্রয়োগও বৈদিক যুগে দুর্লক্ষ্য নয়। সুশ্রুত, চরক, ধন্বন্তরী প্রমুখ ক্ষণজন্মা চিকিৎসাবিদ্যার জনক। ৩৬৫ দিনে এক বছর, সূর্যের সাতটি রঙ, পৃথিবী গোল -- এসব তথ্য প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন ভারতীয় মুনিঋষিরাই।

ভারতবাসী হিসাবে সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানা আমাদের কর্তব্য। আজকের এই অবিশ্বাস, অবক্ষয় ও সংশয়ের যুগে একমাত্র সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির উদার বাণীই পারে হতাশ অশান্ত ও দিশাহারা মানুষকে সঠিক পথনির্দেশ দিতে। 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মামৃতং গময়' -- আমাদের অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও' -- এই হোক আমাদের প্রার্থনা।

নিত্য সন্ন্যাসী জ্ঞানগুরু অনির্বাণ

কয়েক বছর আগে হঠাৎ একটি বই হাতে আসে। বইটি শ্রীঅরবিন্দের 'Life Divine' -এর বঙ্গানুবাদ 'দিব্য জীবন'। অনুবাদক অনির্বাণ। পড়তে পড়তে চমকে উঠেছিলাম, কারণ ঠিক এই ধরণের অননুকরণীয় বাংলা গদ্য খুব বেশী পড়িনি। বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী হিসেবে তাঁকে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাসনে বসাতে দ্বিধা করিনি। পরে জেনেছি, অনির্বাণ বেদ-উপনিষদ-গীতার মহাভাষ্যকার, সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, আধ্যাত্ম জগতের এক জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র এবং পরম ভাগবত। আত্মপ্রচার বিমুখ এই সত্তম পুরুষ নিজের সম্বন্ধে জানিয়েছেন -- 'স্বরূপত আমি অনির্বাণ -- 'পরিব্রাজকার্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী' নই। গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর সারস্বত মঠের মোহন্ত হিসাবে এইসব উপাধি আমার প্রাপ্য ছিল -- কিন্তু আমার এটা সইল না।'

মহাযোগী অনির্বাণের জন্ম মৈমনসিংহে ১৩০৩ সনের ২৪শে আষাঢ় (১৮৯৬ খ্রীঃ)। পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। আশৈশব অসাধারণ ধী শক্তির অধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থানাধিকারী। ধর্মপ্রাণ পিতা রাজচন্দ্র ধর ও ধর্মপ্রাণা মাতা সুশীলা দেবীর এই মেধাবী সন্তান রত্নটি কিভাবে ধাপে ধাপে পিতৃগুরু শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের কাছে প্রথমে ব্রহ্মচর্য ও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বরদাচরণ ব্রহ্মচারী, নির্বানানন্দ সরস্বতী এবং অনির্বাণে বিকশিত ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন, সে এক আশ্চর্য ইতিহাস। সে ইতিহাস সুতীব্র সাধনা, গভীর ধ্যান ও মহান সিদ্ধির দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। আসামের কোকিলামুখস্থিত আসাম বঙ্গীয় সারস্বতমঠে তিনি বারো বছর পরিচালক ছিলেন। ঋষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিখ্যাত 'আর্যদর্পন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু অনির্বাণ রুক্ষ তপস্বী, নিছক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার এবং শুকনো জ্ঞান তাপস ছিলেন না, ছিলেন সহজিয়া বাউল। গৌরী ধর্মপাল বলেছেন -- 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তম শিল্প'।

নিতান্ত বালক বয়সেই অনির্বাণ তাঁর সারাজীবনব্যাপী সাধন প্রতিমার সাক্ষাৎ লাভ করেন গ্রামের ধূলিমলিন মেঠো পথে চলতে চলতে। একটি কিশোরী রূপের ডালি মেলে দিয়ে বালকের আগে চলেছেন আর মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে বালককে দেখছেন, মুখে রহস্যময় হাসি। তারপর এক সময় হঠাৎ তিনি মিলিয়ে যান। মিলিয়ে গেলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করে গেলেন বালককে। পরবর্তীকালে অনির্বাণ লেখেন -- 'যাঁকে খুঁজছিলাম তাঁকে পেয়েছি, কিন্তু এক অনির্বচনীয় রহস্যরূপে। ... স্পর্শজ্যা যেমন একটা বৃত্তকে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে অনন্তে উধাও হয়ে যায়, তেমনি একেকটি মানুষকে ছুঁয়ে সে যেন অনন্তে মিলিয়ে যায়। হোমশিখারূপে আজও একে হৃদয়ে বহন করে চলেছি -- অনন্ত কাল ধরে চলব।' কিংবা 'ও যদি অমন করে ধরা না দিত, বেদের রহস্য বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব হত। মৃন্ময়ীই চিন্ময়ী হয় যে দৃষ্টিতে, ঋষির সেই দৃষ্টিতে কোন্ সুদূর অতীতে একদিন স্খলিত হয়েছিল বিবসনা বাণীর রূপ। সেই রূপ আমি দেখেছি ... আর প্রাণের ছন্দে তাকে হিল্লোলিত করে চলেছি। চম্পার আলোল কুন্তলের একটি গুচ্ছ কখনো এসে আলগোছে ছুঁয়ে যায় একবার, আর বুকের মধ্যে ফোয়ারা জেগে ওঠে।'

কে ঐ হঠাৎ আবির্ভূতা নারী? কে ঐ রহস্যময়ী অপরূপা? প্রখ্যাত লেখক-সাধক-সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়ের অপূর্ব ব্যাখ্যা -- 'ইনি হলেন বৈদিক ঋষির 'অ-বসনা অনগ্না' বাণী, দেখা না দেখায় মেশা বিদ্যুল্লতা বাক, যিনি -- বেদ বলছেন -- স্বয়ংবরা হয়ে বরণ করেন কোন কোন ভাগ্যবানকে, তাকে করেন সুমেধা, ঋষি, মহাতেজস্বী, সৃষ্টিধর।' অনির্বাণ ছিলেন বেদের অনবদ্য ভাষ্যকার। তিনি যখন দিলীপকুমারদের বেদ পড়াতেন, 'তখন ক্ষণে ক্ষণে এই আবৃতা-অনাবৃতা-বেদবাণীকে মূর্তি নিতে দেখেছি তাঁর প্রবচনে, এক একটি কথায় ঝলমলিয়ে উঠত শব্দের অন্তঃপুর, মনে হত যেন অনাহত আঘাতে খুলে যাচ্ছে 'দেবীর দ্বারঃ', দ্যুলোকের জ্যোতির্দুয়ারগুলি, আর বাণীর বিদ্যুৎ দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ ভাষা যেন গরুড় হয়ে উড়ে যাচ্ছে সেই দ্যুলোক থেকে আলোকসুধা আহরণের জন্য'। রহস্যময়ী ঐ নারীকে অনির্বাণ নাম দিয়েছেন 'হৈমবতী', 'চম্পা', 'হ্রীঙ্কারবীজাক্ষরী পার্বতী' প্রভৃতি।

অনির্বাণের লেখা গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। এগুলি হল ঃ-

১) দিব্য জীবন ঃ শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ ডিভাইন' -এর বঙ্গানুবাদ। শ্রীঅরবিন্দের মতে গ্রন্থটি 'A living translation'.

২) দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ ঃ গ্রন্থটি দিব্যজীবন বইটির প্রবেশক হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩) যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ ঃ শ্রীঅরবিন্দের 'সিনথিসিস অফ যোগ' গ্রন্থের প্রবেশক।

৪) বেদ-মীমাংসা : বৈদিক সাহিত্য ভাবনা ও সাধনা সম্পর্কিত বহু তত্ত্ব এবং তথ্যে সমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত।

৫) উপনিষৎ প্রসঙ্গ : ঈশ, ঐতরেয় ও কেন উপনিষদের ভাষ্য।

৬) গীতানুবচন : গীতারহস্য সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরমালা।

৭) বেদান্ত জিজ্ঞাসা : বেদান্তের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সরল আলোচনা।

৮) প্রবচন (১ম - ৪র্থ খণ্ড) : আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় নানা প্রসঙ্গ।

৯) পত্রলেখা (১,২,৩) : ধর্ম, দর্শন, যোগ, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গ।

১০) পথের সাথী (১,২) : ধর্ম, দর্শন, যোগ, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গ।

১১) কাবেরী কবিতাবলী

১২) স্নেহাশিস্ অধ্যাত্ম বিষয়ক পত্র সংকলন।

১৩) প্রশ্নোত্তরী অধ্যাত্ম বিষয়ক পত্র সংকলন।

১৪) দক্ষিণামূর্তি শঙ্করাচার্য রচিত স্তোত্রের ব্যাখ্যা।

১৫) শিক্ষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা।

১৬) সাহিত্য প্রসঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা।

১৭) পত্রং পুষ্পম্ পত্রাবলী।

১৮) অন্তর্যোগ প্রভৃতি।

অনুরাগী ও ভক্তদের নিয়মিত পত্র লিখতেন অনির্বাণ। প্রসাদ দাক্ষিণ্যে তিনি মুক্তহস্ত, অকৃপণ। বিমুখ করেননি কাউকেই। বহু জটিল কুটিল প্রশ্নের সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব মৌখিক ব্যাখ্যা তাঁর প্রবন্ধাবলী এবং পত্ররত্ন ভাণ্ডারে থরে থরে সাজানো রয়েছে। পত্রগুলি কেবল পত্র নয় — অননুকরণীয় গদ্যে লেখা অব্যর্থ পথনির্দেশ। 'ভাই, যত পারো — যতক্ষণ পারো ধ্যান করো' অনির্বাণ লিখছেন ভক্তকে, 'ঈর্ষা বিদ্বেষ সংকীর্ণতা ভুলে যাও — উদার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখ — বিরাটের অভিযান। ভাই, এই কি চিত্ত আঁধার করে রাখবার সময়? সম্মুখে দীপালি! লক্ষ প্রাণের দীপালি। লক্ষ প্রাণের বর্তিকা জ্বালিয়ে তোলো। তোমার প্রাণপ্রদীপের শিখা জ্বলে উঠুক — অমনি দেখবে অমন লক্ষ প্রদীপে মা'র আরতি হচ্ছে।' কয়েকটি উদ্ধৃতি উপহার দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। যন্ত্রণায় আর্ত এক ভক্তকে অনির্বাণ লিখছেন — 'এই যে অসহ্য যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে চলেছেন — এও তো তাঁর করুণা, তাঁর প্রসাদ। নইলে আপনি হয় তাঁকে ভুলে থাকতেন, নয়তো ঠিক উলটো পথ ধরতেন আর

দশজনের মতন। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, Whoever chooses the Divine has already been chosen by the Divine আমরা তাঁকে যে চাইতে পারছি, এ তিনিই আমাদের চাইছেন বলে। এই কথা ধ্রুব জেনে অনন্ত প্রতীক্ষায় জেগে থাকুন। এই কষ্ট দিচ্ছেন তিনি মনের সমস্ত খাদ পুড়িয়ে আমাদের খাঁটি সোনা করবার জন্যই।' আর একটি রত্ন উদ্ধার -- 'বাস্তবিক, গোপী না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভালবাসতে হবে ঠিক মেয়েছেলের মত, ঠিক মীরার মত। পুরুষভাব একেবারে বিসর্জন দিতে হবে। ... আর পুরুষভাব যদি নিতান্তই বিসর্জন দিতে না পারি, তাহলে থাকব তোমার কিশোর সখা হয়ে, তোমার মাঠে তোমার সঙ্গে ধেনু চরাব। এই আমার কাজ। কর্ম তো নয়, গোষ্ঠলীলা। দিনের বেলায় গোষ্ঠ আর রাত্রে কুঞ্জসেবা। তখন আর সখা নই, সখী, আমি তোমার সুবল, তোমার কর্মসখা, নর্মসখা -- গোপন কথাটি যার কাছে তুমি উদ্ঘাটিত করেছ, সে একাধারে তোমার সখা ও সখী দুই-ই। ... কিচ্ছু চাইবেন না তাঁর কাছে -- মুক্তি নয়, জ্ঞান নয়, পুনর্জন্ম নিরোধ নয়, সাধনার কৃচ্ছ্রতা বা ঐশ্বর্য বা বিভূতি কিছুই নয়। শুধু 'আমরা তোমায় ভালবাসি'। কখনও বা ব্যক্ত করেছেন নিজের উপলব্ধি অনায়াস সারল্যে। অনির্বাণ তখন সতের বছরের তরুণ। আশ্রমে এসেছেন কলেজের ছুটিতে। সন্ধ্যার পর আসনঘরের সামনে কেউ নেই, রয়েছেন কেবল গুরু ও শিষ্য -- স্বামী নিগমানন্দ ও অনির্বাণ। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ। নির্মেঘ ঘন কালো আকাশ। হঠাৎ নিগমানন্দ শিষ্যকে ফিস ফিস করে বললেন -- 'এই যে কালো আকাশ দেখতে পাচ্ছ, এ ও যেমন সত্য, তেমনি এই আকাশ আলোর আকাশ। দিনরাতের পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে। সেখানে দিনরাত নাই। ব্রহ্ম যুগপৎ আলো এবং কালো -- এইটি যেদিন বুঝবে সেইদিন তোমার সম্যক জ্ঞান হবে। বলেই উঠে ভিতরে চলে গেলেন। সেদিন থেকে আমার চেতনায় এই নিয়ে আর কোনো দ্বন্দ্ব রইল না।' এইভাবে স্ফটিক-স্বচ্ছ ভাষায় তিনি জিজ্ঞাসু জনের অন্ধকার দূর করে দিতেন।

এই জ্ঞানতাপস মহাযোগী ছিলেন শীর্ণকায়, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রমী। গুরুগৃহে ছিলেন যখন, তখন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পরিশ্রম করতেন একুশ ঘন্টা। বিরক্ত হতেন না, বরং প্রাণের গভীরে প্রবাহিত হত খুশীর উচ্ছলন। তাঁরই অনুপম ভাষায়, 'মাটি কোপাতে হচ্ছে -- যেন সুন্দর করে কোপাতে পারি। ধান ভান্‌তে হচ্ছে, যেন সুন্দর করে ভান্‌তে পারি। ছাত্রদের বেদান্তের পাঠ দিতে হচ্ছে, যেন সুন্দর করে দিতে পারি। স্ত্রী যেমন করে স্বামীর সেবা করে, তেমনি করে সেবা করা। আর তাইতে বুক ভরে উঠত, চোখে আলো ফুটত, শিরায় শিরায় শক্তি আর আনন্দের স্রোত বইত।'

এই মধুর সমর্পণ, এই অনাসক্তি আর এই পরম ঈশ্বর নির্ভরতাই তাঁকে করে তুলেছে মহান সাধক। আর তার সঙ্গে রয়েছে গভীর সাধনা। 'কর্ম তখনই সুন্দর হতে পারে যখন তার মধ্যে থাকে ভূমার স্পর্শ' -- মন্ত্রের মতো অমোঘ এই বাক্যটি তো

অনির্বাণেরই। এই ভূমা-স্পর্শ, এই ভূমা-স্বাদ, এই ভূমা অনুভব প্রতি মুহূর্তে লাভ করতেন বলে তাঁর সমস্ত কাজই পূজা হয়ে উঠত।

'ছোটবাবা' ও শ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী

'তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ণ আনন্দের অধিকারী শ্রী পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায় তাঁর মহান গুরু শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর শিষ্য শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীকে। পূর্ণানন্দ ছিলেন বালানন্দজীর প্রথম মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ। 'ছোটবাবা' নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন তারানন্দজীর সাধনপথের দিশারী, গুরুতুল্য গুরুভাই এবং 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা।'

পূর্ণানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম শ্রী পূরণচাঁদ মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার জনাই গ্রামে ১৮৭৫ সালে এক সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারে তাঁর জন্ম। ছোট থেকেই তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী, ঈশ্বরগতপ্রাণ। ধর্মসভায় বৃদ্ধদের মধ্যে বালক পূরণচাঁদকে দেখা যেত — একমনে শুনছেন বেদ-উপনিষদ-গীতার আলোচনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর সবান্ধব 'বুদ্ধদেব' নাটক দেখতে যান। ঐ নাটক এবং বুদ্ধদেবের জীবনী তাঁর মনে গভীর দাগ রেখে যায়। বাবা মা জীবিত থাকতেই পূরণচাঁদ আশ্রয় ও দীক্ষাগ্রহণের জন্য 'সচল শিব' বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে যান। কিশোর বৈরাগীকে যোগিবর বাবা মায়ের অনুমতি আনতে বলেন। পূরণচাঁদ ব্যর্থ হন। মাতৃবিয়োগের পর বাবা দুর্গাচরণের সম্মতি নিয়ে তিনি আবার যান বালানন্দজীর কাছে। এবার আর বিমুখ করলেন না কৃপাসিন্ধু মহাত্মা। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর নাম হল পূর্ণানন্দ। অল্পদিনেই শ্রীগুরুর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র, একনিষ্ঠ সেবক ও বিশ্বস্ত পার্শ্বচর হয়ে সকলের কাছে 'ছোট বাবা' রূপে পরিচিত হলেন। শ্রীগুরুর শিক্ষা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁকে ধীরে ধীরে সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিল।

শঙ্করাচার্যের মতো বালানন্দজীরও ইষ্টদেবী শ্রীশ্রী বালেশ্বরী। পূর্ণানন্দজী এই মূর্তি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন এবং বালানন্দজী কর্তৃক করণীবাদ আশ্রমে তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী (জন্ম ১৮৭৫ - মহাপ্রয়াণ ১৯০১) তরুণ বয়সেই বালানন্দজীর আশ্রয় প্রার্থী হবার আশায় গৃহত্যাগ করেন। সাধক সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁকে তার দাদা পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দেওঘর রামনিবাস আশ্রমে সেই প্রথম দুজনের দেখা এবং কথোপকথন। সাক্ষাৎকারের সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতি তারানন্দজী কখনও বিস্মৃত হননি। সেইসব কথা কোনও ভক্ত জিজ্ঞেস করলে স্বল্পবাক শ্রীমহারাজের যেন মুখের আগল খুলে যেত। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক তরুণের সঙ্গে সেদিন তিনি যে ব্যবহার করেছিলেন, সহযোগিতার যে উদার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। পূর্ণানন্দজীর নির্দেশেই তরুণ তারকদাস চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে তারানন্দ ব্রহ্মচারী) তপোবনে বালানন্দজীর কাছে যান। বালানন্দজী তাঁকে মায়ের অনুমতি আনতে বলেন। ফিরে যান তারকদাস বিধবা মা শৈলনন্দিনী দেবীর কাছে। মা অসম্মত হলেন। অগত্যা পলায়ন এবং দেওঘর গমন। আবার দেখা করলেন 'ছোট বাবা'র কাছে, জানালেন সব কথা। পূর্ণানন্দজী বললেন 'আবার তপোবনে গুরুজীর কাছে যাও। তাঁকে বলো, মায়েরা যে সহজে মত দিতে চান না, এ তো আপনি জানেন। এ অবস্থায় আপনার যদি ইচ্ছে হয় আমাকে রাখুন, না হলে আমি অন্য কোথাও চলে যাবো।'

পূর্ণানন্দজীর কথানুযায়ী তারকদাস বালানন্দজীকে সব কথা জানালেন। এবার আর প্রত্যাখ্যাত হলেন না। আশ্রমবাসী হবার নির্দেশ পেলেন। পূর্ণানন্দজী না থাকলে তরুণ, অনভিজ্ঞ তারকদাস কি এত সহজে যোগাবতারের সম্মতি আদায় করতে পারতেন?

পূর্ণানন্দজীর সহায়তায় তারকদাস পেলেন বালানন্দজীর শারীরিক সেবার গুরু দায়িত্ব। দীক্ষাগ্রহণের পর তারকদাসের নামকরণ করা হল তারানন্দ — শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী। তরুণ তারানন্দকে যোগ ও নানাবিধ সাধনক্রিয়ায় সুদক্ষ করে তুললেন ছোট বাবা। তিনিই তারানন্দজীকে দিয়ে ছিলেন করণীবাদ আশ্রমের ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজার ভার। তাঁর চেয়ে প্রায় ছাব্বিশ বছরের ছোট তারানন্দজীকে তিনি পাণিনি ব্যাকরণ থেকে শুরু করে যাবতীয় হিন্দু শাস্ত্র অনুধাবন করতে সাহায্য করেন। নিজ গুরু এবং ছোট বাবার কাছ থেকে তারানন্দজী শিখেছিলেন দৈব ওষুধ প্রয়োগের দ্বারা ব্যাধি নিরাময়ের বিদ্যা। ছোট বাবা তাঁকে নিয়ে তীর্থ পরিক্রমাও করেছেন।

পূর্ণানন্দজীর উপদেশগুলি তারানন্দজীকে খুবই অনুপ্রাণিত করত। ভক্ত-সঙ্গে প্রায়ই তিনি ছোটবাবার উপদেশগুলি বলতেন। একটি উপদেশ এখানে উদ্ধৃত হল —

'লোকে রিষ্টওয়াচ পরে সংসারের কত কাজ করে বেড়ায়, কিন্তু তার হাতের ঘড়ি নিজের নির্দিষ্ট পথে অনবরত টিক টিক করে যায় -- একটুও ব্যতিক্রম হয় না -- তেমনি মনের মধ্যে একটি রিস্টওয়াচ পরে থাকতে হবে। সংসারের সব কাজের মধ্যে মন যেন সেই এক নামে শ্রীভগবানের দিকে, তোমার ইষ্টমন্ত্রে অনুক্ষণ লেগে থাকে -- দাঁতের ফাঁকে সুপারির টুকরা আটকানোর মত।'

গৌরবর্ণ, সুদর্শন তারানন্দ ব্রহ্মচারী যে উচ্চস্তরের সাধক হয়ে উঠছেন পূর্ণানন্দ তা লক্ষ্য করছিলেন। নেপাল পরিভ্রমণকালে তিনি তরুণ ব্রহ্মচারীকে বলেন যে কেউ যদি দীক্ষা নিতে চায় তারানন্দজী যেন অমত না করেন। তাঁর নির্দেশ পাবার পর তারানন্দজী দীক্ষা দিতে শুরু করেন।

বারো বছর তারানন্দজী ছোটবাবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন (১৯২১-১৯৩৩)। তারপর এলো 'শেষের সে দিন'। বাংলা ১৩৪০ সনের ৭ই ভাদ্র গুরুদেবের কোলে মাথা রেখে আত্মপ্রচার বিমুখ মহাসাধক ছোটবাবা, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলীন হন। তারানন্দ ব্রহ্মচারীর মতে, তাঁর মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু।

ছোটবাবা সম্বন্ধে তারানন্দ মহারাজ লেখেন -- 'পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন সমাধি সিদ্ধ। এই ভূমিতে আরূঢ় হইয়া তাহার ফল উক্ত সমাধি যোগে প্রত্যক্ষ করিয়া 'সরল যোগ সাধন' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু কঠোর তপস্যা ও আরাধনা দ্বারা বালাত্রিপুরাদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হয়েন। এক কথায় তিনি মাতৃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।'' তারানন্দজী গুরুতুল্য এই সাধকের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন মাতৃসেবার আদর্শ। 'ভাই! এ আশ্রমে যা কিছু দেখছো সবই তোমার, অথচ কিছুই তোমার নয়' -- ছোটবাবার এই 'একটি মাত্র উপদেশ ধ্রুবতারার মত কার্য করিয়া এ জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে ও করিতেছে' -- তারানন্দজী লেখেন। ছোটবাবার মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় দুটি শোকগাথা রচনা করে তাঁর প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদন করেন। বাংলা শোকগাথার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ-

'যে আদর্শ মহান রেখে গেলে তুমি
নিত্য ধ্রুবতারাসম থাকিয়া সম্মুখে।
দেখাইবে পথ সদা অন্ধকার রাতে
এই তব সান্ত্বনা-বারি জীবনের পথে।'

রিষড়া প্রেম মন্দিরে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির পাশে তারানন্দ ব্রহ্মচারী যে দুই সাধকের প্রতিকৃতিকে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী, অন্য জন হলেন তাঁর 'ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যাণ্ড গাইড' শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। তারানন্দজীর জীবন ও সাধনায় তাঁর প্রভাব অপরিসীম।

গুরু, সৎগুরু, গুরুভক্তি

কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, মানব-জীবনে তেমনি গুরু ছাড়া গতি নেই। সারা জীবনেই মানুষকে বিভিন্ন গুরুর সংস্পর্শে আসতে হয়, কেননা 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। গুরুই শেখান। তাঁর হাত ধরেই মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ করে। জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দিয়ে তিনি অনুগত শিক্ষার্থীর চক্ষু উন্মীলন করে দেন।

শৈশবে পিতা মাতা এবং ছাত্রজীবনে শিক্ষকই গুরু। শুধু গুরু নন, মহাগুরু। শাস্ত্রে এঁদের দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীত জগতে গুরুর মর্যাদা ও সম্মান অপরিসীম। এক একজন বড় বড় ওস্তাদ শিষ্যের কাছ থেকে উচ্চস্তরের ধর্মগুরুর মতোই শ্রদ্ধা ও সম্মান পান। ধর্ম বা সম্প্রদায় সে ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। যে কোনো বিষয়ে কিছু শিখতে বা জানতে হলে গুরুর শরণাপন্ন না হলে চলবে না।

ধর্মজগতে প্রবেশের জন্য গুরুকরণ অপরিহার্য। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। উপযুক্ত গুরু ছাড়া ধর্মাচরণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই বহু প্রাচীন কাল থেকে এদেশে চলে আসছে গুরু-শিষ্য পরম্পরা। ভাবতে অবাক লাগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও গুরু ছিলেন। পৌরাণিক যুগের বহু বিখ্যাত গুরুর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। রাজ দরবারে গুরু বা আচার্য প্রবেশ করলে স্বয়ং রাজা মশাই সিংহাসন থেকে উঠে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতেন। এমনই ছিল গুরুর মর্যাদা।

মহাত্মা কবীরের ভাষায়, 'গুরু চন্দন সুবাস' -- অর্থাৎ গুরু হচ্ছেন সুবাসযুক্ত চন্দন, 'গুরু পারশ' -- অর্থাৎ গুরু পরশ পাথর, 'গুরু নূর তমাম' -- অর্থাৎ গুরু পূর্ণ জ্যোতি স্বরূপ। প্রকৃত সৎগুরুর অপার মহিমার কথা কি বলে শেষ করা যায়? গুরু আর গোবিন্দ একই সঙ্গে উপস্থিত হলে প্রথম প্রণামটি গুরুকেই করতে হয়, কারণ তিনিই তো চিনিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দকে। যে সৎগুরু পায়নি, আকাশে কোটি চন্দ্র-সূর্যের উদয়েও তার চতুর্দিক অন্ধকার। যেখানে সৎগুরু, সেখানে আলো -- সেখানে শান্তি -- সেখানে চিরবসন্ত।

বাস্তবিক, প্রকৃত সৎগুরুর দর্শন ও কৃপা লাভ করলে বিলীন হয়ে যায় জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার। প্রথম দর্শনেই চেনা যায় এমন সৎগুরু। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন -- 'প্রকৃত গুরুর দর্শন মাত্রেই তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও দিন দিন আরো নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহার নিকট যাইবা মাত্রই যেন সংসারের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায় -- মনে যেন আর সংসারের লেশমাত্র থাকে না। তাঁহার পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিলে সাধক চারিদিকে আনন্দের পাথার দেখিতে পান' (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)।

গুরুর কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় শ্রীমদভাগবতে বর্ণিত অবধূতের উপাখ্যানের কথা। ধর্মজ্ঞ যদু এক অবধূতকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিভাবে তিনি সংসার সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভয়ে এবং সানন্দে পৃথিবী পর্যটন করছেন। উত্তরে অবধূত বললেন যে তিনি চব্বিশ জন গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। এই চব্বিশজন গুরুর নাম -- পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ , মধুমক্ষিকা, হস্তী, ব্যাধ, হরিণ, মীন, গণিকা পিঙ্গলা, কুরুর পক্ষী, বালক, কুমারী, শর নির্মাতা, সাপ, মাকড়সা এবং কাঁচপোকা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইসব গুরুর কাছ থেকে অবধূত কি কি শিক্ষা লাভ করেছেন তার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে।

গুরুসেবক শিষ্য কেমন হবে? শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসারে সে 'নিরহঙ্কার, মাৎসর্যহীন, নিরলস, মমতাশূন্য, গুরুভক্তিপরায়ণ, অব্যগ্র ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হবে এবং অসূয়া ও বৃথালাপ পরিহার করবে। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে আত্মার প্রয়োজন সমান দেখে উদাসীন হয়ে সে শুধু গুরুর উপাসনা করবে।

'আচার্য হলেন নিম্নস্থিত অরণি, শিষ্য উপরিস্থিত অরণি, আচার্য্যের উপদেশ মধ্যস্থিত অরণি, আর এদের সংযোগের সমুৎপন্ন বিদ্যা অগ্নি;এই অগ্নিই অজ্ঞান রাশিকে দগ্ধ করে। নিপুণ শিষ্য অতিবিশুদ্ধ আত্মবিদ্যা লাভ করে গুণসম্ভূত মায়াকে নিবৃত্ত করে এবং এই বিশ্বের কারণ স্বরূপ গুণরাশি ভস্মীভূত করে ইন্ধন শূন্য অগ্নির মত নিজেও বিরত হয়।'

আত্মানন্দ ও আত্মজ্ঞান গুরুসেবার দ্বারাই লাভ করা যায় --
'গুরুসেবাপ্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে
অনেন গুরুমার্গেন আত্মজ্ঞানং প্রবর্ততে (গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা)।

আর কেউ নন, এই পৃথিবীতে শিষ্যের ইহকাল পরকালের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী হলেন গুরু। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি শিষ্যের সমস্ত পাপের ভার গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিরজানন্দ চমৎকার বলেছেন -- 'পাপের ভার গুরুকে

বা ভগবানকে দিতে হলে সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের ভাগও দিতে হয়। খালি দুঃখভোগের অংশটি দিলুম আর সুখভোগের অংশটি নিজের জন্যে রাখলুম তাহলে তোমারও ঠিক ঠিক দেওয়া হয় না, তাঁরও নেওয়া হয় না। ... গুরুর উপর যদি বিন্দু মাত্র ভালবাসা, শ্রদ্ধাভক্তি থাকে তাহলে নিজের যত ময়লা আবর্জনাগুলো তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁকে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করাতে কি প্রাণ চাইবে? গুরু কি ময়লা ফেলার গাড়ি না কি? যাদের সে ভালবাসা ভক্তি নেই, যারা ঘোর বিষয়ী, স্বার্থপর, তাদেরই এইরকম হীনবুদ্ধি হয়। তারা তো শিষ্য বলেই গণ্য হবার উপযুক্ত নয়। আর যাদের গুরুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আছে, তারা সেই ভয়ে আর পাপ কাজ করতে পারবে না, পাছে গুরুকে ভুগতে হয়। হ্যাঁ, এই রকম শিষ্যের পাপের ভার তিনি নেন। বস্তুতঃ ভগবানই গুরুরূপে তার ভার গ্রহণ করেন ও তাকে উদ্ধার করেন।'

স্বামী বিরজানন্দ স্বীকার করেছেন যে শিষ্যের কিছু পাপ গুরুতে আসে। 'কারণ প্রায়ই দেখা যায়, নির্বিচারে অনেককে মন্ত্রদীক্ষা দিলে সদগুরুর নিষ্পাপ শরীরে কঠিন রোগ আশ্রয় করে তাঁর আয়ুক্ষয় করে। স্বার্থশূন্য পরম কারুণিক সদগুরু জেনেশুনে পরের হিতের জন্যে তাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যাবার প্রেরণায় নিজের শরীরের জন্য ভাবেন না, শিষ্যদের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন তিলে তিলে দান করেন। ... ঠাকুর বলতেন, গিরিশের পাপ নিয়ে আমার শরীরে এই ব্যাধি' (পরমার্থ প্রসঙ্গ)।

সৎগুরুর মতো অসাধারণ গুরুভক্তিপরায়ণ শিষ্যের কথাও আমরা জানি। ভক্তশ্রেষ্ঠ একলব্যের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

একলব্য ছিলেন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। অস্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে গেলে অস্ত্রগুরু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ একলব্য নিষাদপুত্র। বিষণ্ণ একলব্য বনে চলে গেলেন। সেখানে দ্রোণের মূর্তি গড়ে এবং তাঁকেই গুরুরূপে কল্পনা করে একনিষ্ঠভাবে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা লাভ করতে লাগলেন। কালক্রমে এই বিদ্যায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করলেন।

একদিন অর্জুন ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে আচার্য দ্রোণ ঐ বনে মৃগয়া করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল। জটাবল্কলধারী ধ্যানমগ্ন একলব্যকে দেখে সে চিৎকার করতে লাগল। একলব্যের ধ্যান ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে তিনি সাতটি শব্দভেদী বান মেরে কুকুরের মুখের শব্দ বন্ধ করে দিলেন। কুকুর সেই অবস্থায় দ্রোণ ও তাঁর শিষ্যদের কাছে ফিরে গেল। তাঁরা কুকুরের ঐ অবস্থা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং শরনিক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে ধ্যানরত একলব্যের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। একলব্য নিজেকে দ্রোণের শিষ্য বলে পরিচয় দিলেন।

অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন যে গুরু তাঁদের সর্ববিদ্যায় পারদর্শী

করেননি। তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বীর যে জগতে আছেন এতক্ষণে তিনি তা বুঝতে পারলেন।

অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রোণ নিষাদপুত্রের কাছে এসে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। একলব্য আগের মতোই বললেন যে তিনি দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। দ্রোণ একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দক্ষিণাস্বরূপ চাইলেন। গুরুভক্ত একলব্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐ আঙুলটি কেটে গুরুকে দিলেন। গুরুভক্তির এহেন নিদর্শন দুর্লভ। শঙ্করাচর্যের প্রথম এবং সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য সনন্দনের গুরুভক্তিও অতুলনীয়।

সনন্দন একদিন কোনো কাজে অলকানন্দার ওপারে গিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য সেইসময় তাঁর প্রিয় শিষ্যকে খুঁজছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন শিষ্যও ছিলেন। হঠাৎ একজন শিষ্য সনন্দনকে দেখতে পেলেন নদীর ওপারে।

শঙ্করাচার্য ব্যাকুলভাবে তাঁকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। সনন্দন গুরুর আহ্বান শুনতে পেয়ে ভাবলেন, নিশ্চয় তাঁর গুরু কোনও সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন। দ্রুত পৌঁছবার জন্য তিনি তীব্র খরস্রোতা নদীতে নামতেই তাঁর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পদ্ম ফুটে উঠল। আর ঐ পদ্মের ওপর পা ফেলে ফেলে অনায়াসে দ্রুত নদী পেরিয়ে তিনি আচার্যের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঐ দৃশ্য দেখে শিষ্যরা অভিভূত হলেন। শঙ্করাচার্য সনন্দনকে বললেন, পদ্মের ওপর পা ফেলে তুমি খরস্রোতা নদী পার হয়েছো। তাই আজ থেকে তোমার নাম হল পদ্মপাদ। এই নামেই তুমি বিখ্যাত হবে।

আর একটি ঘটনা।

হত্যার উদ্দেশ্যে এক অমাবস্যার রাতে উগ্রভৈরব শঙ্করাচার্যকে নিয়ে এসেছে গভীর অরণ্যে। ছিন্ন করা হবে তাঁর মস্তক। উগ্রভৈরব তাঁকে বুঝিয়েছে, সে যদি কোন রাজা বা সর্বজ্ঞের ছিন্ন শির দিয়ে রুদ্রের হোম করতে পারে, তবে সে শিবলোকে স্থান পাবে। তাই সে আচার্য শঙ্করের শরণাপন্ন হয়েছে। শঙ্কর রাজীও হয়েছেন তাঁর প্রস্তাবে।

সবকিছু প্রস্তুত। আচার্য একটু সময় চেয়ে নিয়ে যোগাসনে বসে ধ্যানস্থ হলেন।

এদিকে পদ্মপাদ হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন, এক ভয়ঙ্কর কাপালিক গহন অরণ্যে "তাঁর গুরুদেবের মস্তক ছেদনে উদ্যত হয়েছে। স্বপ্নভঙ্গের পর তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর আরাধ্য নৃসিংহদেবকে স্মরণ করে গুরুদেবের জীবনরক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহদেব তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। পদ্মপাদ ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে অরণ্যে প্রবেশ করে উগ্রভৈরবের উদ্যত খড়্গ কেড়ে নিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন। পদ্মপাদের গুরুভক্তি সতীর্থদের বিস্মিত করল।

'এই অগাধ ভবজলধি উত্তরণের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুকৃপা। বিশেষ করে আচার্য শঙ্করের মতো 'মহাপুরুষ সংশ্রয়' বাস্তবিকই দুর্লভ। এ হেন গুরুকৃপার ফলে মাধকের লাভ হয় চতুর্বর্গফল, আত্মকামের আত্মদর্শন হয় 'করামলকবৎ'। অবশ্য গুরু দেহমাত্র নন। দেহের মধ্যে দেহী বাস করেন চিদ্‌রূপে, সেই চিৎ শক্তিই প্রকৃত গুরুশক্তি' (আচার্য শঙ্কর - স্বামী অপূর্বানন্দ)।

সংসার, কবীরের ভাষায় 'কাগজকী পুড়িয়া', 'কাঁটকী বাড়ী', 'ঝাড় ঔ ঝাঁখর' অর্থাৎ সংসার কাগজের পুরিয়া, কাঁটায় ভরা, কাঁটার ঝাড়। এ থেকে বাঁচবার উপায় কি?

উপায় সৎগুরু সংশ্রয়। তিনিই ঘুচিয়ে দেন চোখের পর্দা -- 'পরদা দূর করৈ আঁখিনকা'। তিনিই ব্রহ্মদর্শন করান -- 'ব্রহ্ম-দরস দিখলাবৈ'। তাই তনু-মন-প্রাণ গুরুকে অর্পণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গুরুসেবাই মোক্ষফল -- 'গুরু কি সেবা মুক্তিফল'।

মূর্তিমতী দিব্যচেতনা ঃ শ্রীমা

'তোমরা যারা অশ্রুপাত করছ, যারা কষ্ট পাচ্ছ, যারা ভয়ার্ত, জান না কতদিন চলবে তোমাদের এই দুর্দৈব, এ দুঃখের কি ফল, তাকিয়ে দেখ ঃ এমন রাত্রি নেই যার শেষে প্রভাত আসে না, অন্ধকার যখন ঘনীভূত হয় তখনই প্রভাত আসন্ন, ... এমন ঝড় নেই যার শেষে সে এঁকে ধরে না তার বিজয়ের ইন্দ্রধনু।'

আর্ত ও পরাজিত মানুষকে যিনি উজ্জীবিত করেছেন 'মাভৈঃ' মন্ত্রে, গহন রাত্রির শ্বেতশুভ্র আভা থেকে যিনি 'সিদ্ধির গুপ্ত পথ' আর 'আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সব রহস্য' পাবার সন্ধান বলে দিয়েছেন, উচ্চারণ করেছেন সেই অমোঘ বাণী – 'দীনতা হীনতার অন্তরেই লালিত পালিত হয় মহান মহিমা' – তিনি মহাসাধিকা, জগজ্জননী, পণ্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সর্বজনপূজ্যা শ্রীমা।

শ্রীমায়ের জন্ম প্যারিসে, ১৮৭৮ সালের ২২ -এ ফেব্রুয়ারী। নিজের কথা বলতে গিযে মা নিজেই জানিয়েছেন, সাত বছর বয়সের আগে শুরুই হয় তাঁর লেখাপড়া। অথচ তাঁর যোগের শুরু মাত্র চার বছর বয়সে। ছোট্ট একটা চেয়ারে বসে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন আর মাথার ওপর একটা তীব্র আলো এসে তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে তোলপাড় করে দিত। ক্রমশ তিনি অনুভব করতে লাগলেন বৃহৎ কোনও ভগবৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য তিনি যেন ঈশ্বর-প্রেরিত।

একটু বেশী বয়সে মা স্কুলে ভর্তি হন। তিন বছর পর থেকে প্রতি শ্রেণীতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। অল্পবয়স থেকেই তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী। প্যারিসের কাছে এক বিখ্যাত বনে ছেলেবেলায় বেড়াতে গিয়ে কোনো এক বহু প্রাচীন গাছের নীচে তিনি চুপটি করে বসে থাকতেন আর সঙ্গে সঙ্গে তন্ময় হয়ে যেতেন। ঐসব প্রাচীন গাছগুলির সঙ্গে তিনি তাঁর অন্তরের গভীর সংযোগ অনুভব করতেন। ঐসময় পাখি আর কাঠবিড়ালীরা তাঁর কাছে নির্ভয়ে ছুটে আসত, তাঁর গায়ে বসত। নানা ধরণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁর হতো ঐ অল্প বয়সেই। ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সংশয় রইল না এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হওয়াও যে অসম্ভব নয়, সে সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত হলেন। ঘুমের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুরুদের সান্নিধ্য অনুভব করতেন এবং তাঁর

আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি কিভাবে কার্যকরী করা যায়, সে সম্পর্কে তাঁরা তাঁকে শিক্ষা দিতেন। মা জানিয়েছেন — 'এঁদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠল। .... তখন থেকে আমি তাঁকে নিজেই 'কৃষ্ণ' বলে ডাকতে শুরু করলাম।' মা এ-ও জানতেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে দিব্যকর্ম সাধন করতে হবে।

১৯১৪ সালের ২৯-এ মার্চ স্বামী পল রিশারের সঙ্গে শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে আসেন। শ্রীঅরবিন্দকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনিই সে ব্যক্তি যাঁকে তিনি 'কৃষ্ণ' বলে ডাকতেন। পরে শ্রীমা যখন পণ্ডিচেরী আশ্রমের অতিথিশালায় থাকতেন, তখন শ্রীঅরবিন্দ দেখতেন শ্রীমায়ের হাত ধরে রয়েছেন বালক কৃষ্ণ।

শ্রীঅরবিন্দকে দেখবার পর শ্রীমা ১৯১৪ সালের ৩০এ মার্চ লেখেন — 'আজ আমরা যাঁকে স্বচক্ষে দেখলাম, তিনি তো এই পৃথিবীতেই এখন বাস্তব হয়ে অবস্থান করছেন, তাঁর এই উপস্থিতিটাই এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে এমন একদিন শীঘ্র আসছে যখন এই নিগূঢ় অন্ধকার উজ্জ্বল আলোকে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তোমার স্বর্গরাজ্য একদিন সত্য সত্যই এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

শ্রীঅরবিন্দকে গুরু হিসাবে বরণ করে শ্রীমা তাঁর স্বামীর সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে থেকে গেলেন। কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তাঁরা প্যারিসে ফিরে গেলেন। কয়েকবছর পরে শ্রীমা একাই চলে এলেন পণ্ডিচেরীতে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

১৯২৬ সালের ২৪ -এ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণসিদ্ধি লাভের পর আশ্রমের দায়িত্বভার শ্রীমা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অকল্পনীয় ছিল তাঁর কর্মশক্তি, সাংগঠনিক প্রতিভা ও পরিচালন ক্ষমতা। মূলতঃ তাঁর উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই আশ্রম ধীরে ধীরে অনেক বড়ো হয়ে উঠল। খোলা হল অনেকগুলি বিভাগ — কৃষি, শিল্প, পূর্ত, পোষাক তৈরী, খাদ্য, ডেয়ারী, পোলট্রি, বেকারী, কুটিরশিল্প, ছাপাখানা, জুতো তৈরী, ঔষধালয়, যন্ত্র মেরামতি, কাগজ তৈরী প্রভৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত হল শ্রীমার গড়া বিশ্ববিদ্যালয় — শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র, যার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগের সুষম সমন্বয় সাধন শ্রীমা চাইতেন।

শ্রীঅরবিন্দের মতে — শ্রীমা জগন্মাতা, তাঁর চার স্বরূপ — মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। তিনি আবার দেশমাতৃকারূপিনীও। বিশ্বকল্যাণের কাজে তিনি এই শক্তিগুলি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলতেন — 'মা হলেন শাশ্বত দিব্য শক্তি। এখানে তিনি দেহ ধারণ করে এসেছেন এমন কিছু এই বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার জন্য, যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি।' কি সেই জিনিস? তা হল অতিমানস চেতনা — মর্ত্যমানবের

মহামানবে জ্যোতির্ময় রূপান্তর। এরজন্য করণীয় কী? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন -- The Mother herself is the destination, everything is in her' অর্থাৎ মাই-ইগন্তব্যস্থল, সবই আছে তাঁর মধ্যে। তাই ডাকতে হবে তাঁকে অকপট বিশ্বাসে, শিশুর সারল্যে, ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে। সংশয়, সন্দেহ, হতাশা, অবিশ্বাস মনের জমিতে পুঁতে দিতে পারে জবরদখলের পতাকা, আলেয়ার মতো হাতছানি দিয়ে ডাকতে পারে কামনা বাসনার রামধনু-আলো। কিন্তু যত বাধাই আসুক না কেন, শ্রীমা বলছেন, কেউ যেন হাল ছেড়ে না দেয়। 'যখন গহন রাতের অন্ধকারে নিতান্ত একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ, তখন দেখবে তার মাঝেই জ্বলছে অমূল্য মাণিমানিক্য, সেগুলিকে নিজের মধ্যে সঞ্চয় কর। কেবল নিজের অন্তরকে অকপট রাখো, তাহলে সবচেয়ে মন্দের ভিতর থেকে সবচেয়ে ভালো জিনিস তোমার মিলে যাবে।'

অকপটে সব কথা বলা যায় শুধু একজনের কাছে। তিনি মা। শুধু একজনের কাছেই আত্মসমর্পণে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই। তিনিও মা। চারিদিকে যখন অহং উদ্যত বর্শা, 'কামাদি ছয় কুমীর', তখন মা নামের দুর্গে বাস করাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। মায়ের কণ্ঠে তাই শুনি অভয়মন্ত্র -- 'আমার এই হাত দুটির মধ্যে আশ্রয় নাও -- তা তোমাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবে।'

সব সময়েই মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে মাকে। তারপর একসময়ে অনুভূত হবে তাঁর দিব্য উপস্থিতি। তিনিই অসত্য থেকে সত্যের পথে জীবনকে চালিত করবেন।

শ্রীমায়ের রচনাবলী কালজয়ী সম্পদ। সেগুলি দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মূল্যবান আকর স্বরূপ। অনবদ্য তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনা বিষয়ক লেখাগুলি। একটি দৃষ্টান্ত --

'নীরবতা নেমে আসে, তারপর আস্পৃহার অনলশিখা জ্বলে ওঠে, তখন দেহ ভরে ওঠে এক কবোষ্ণতায় বিশেষ করে হৃদয় থেকে মস্তিষ্ক অবধি, আর সেই উষ্ণতা হল পরম আনন্দে ভরা রূপান্তরের এক প্রবেগ।

'হে আমার মধুময় অধিরাজ, আমার দয়িত ভগবান, সকল সত্তা আমার এক অদম্য প্রবেগে উচ্চকণ্ঠে জানায় তোমায় ঃ আমি তোমায় ভালবাসি! আমি তোমায় ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি!'

শ্রীমা ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। অসংখ্য মানুষ তাঁর এই শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, আরোগ্য লাভ করেছেন নানা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে, উদ্ধার পেয়েছেন কত না বিপদ - আপদ থেকে। কল্যাণময়ী মা বিমুখ করেননি কাউকে। তিনি যে চিরন্তনী জননী!

১৯৭৩ সালের ১৭ই নভেম্বর, ছিয়ানব্বুই বছর বয়সে শ্রীমা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস, ব্যাকুলভাবে ডাকলে আজও তিনি সাড়া দেন।

মহাযোগীদের লীলা বিভূতি

যোগসিদ্ধ সাধু মহাত্মাদের এমন অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ও লীলা-বিভূতি থাকে 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।' এইসব মহাসাধকরা অবশ্য একেবারেই তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে চান না। বরং এগুলি তাঁরা অপছন্দ করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তাঁদের যোগ-বিভূতি দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

এখানে বিখ্যাত কয়েকজন যোগীর কিছু অলৌকিক ক্ষমতার কথা লিপিবদ্ধ হল।

★★★

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর নানা অলৌকিক যোগ-বিভূতির কথা সর্বজনবিদিত। আজ ঘরে ঘরে তাঁর নিত্যপূজা, নিত্য অনুধ্যান।

চন্দ্রকান্ত পাহাড়ে তপস্যামগ্ন বিখ্যাত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল দাবানল। বন্য প্রাণীদের আর্ত চিৎকারে ধ্যান ভঙ্গ হল তাপসের। এই প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিবলয় থেকে নিস্তার পাবার কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি ব্যাকুল হয়ে স্মরণ করতে লাগলেন ইষ্টদেবকে।

হঠাৎ বিজয়কৃষ্ণের সামনে আবির্ভূত হলেন জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী। বিপন্ন বিজয়কৃষ্ণকে তিনি কোলে তুলে নিয়ে অদাহ্য অবস্থায় ঐ আগুনের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে এলেন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণকে যিনি নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

আর একদিন। বিজয়কৃষ্ণ তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। লোকনাথ ব্রহ্মচারী তখন বারদীতে। তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ভক্তভ্রমর শ্যামাচরণ বকসী। তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা — 'আমার গুরুদেবকে বাঁচিয়ে দাও বাবা।'

লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রসন্ন চিত্তে শ্যামচরণকে ঢাকা ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন — 'আমি নিজে যাবো বিজয়ের কাছে।'

কথা রাখলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। যে রুগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব, সেই বিজয়কৃষ্ণ রোগমুক্ত হলেন। যাঁরা তাঁর সেবা করছিলেন, তাঁরা সবাই দেখেছেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণের শিয়রে বসে রয়েছেন। সূক্ষ্ম দেহে যত্রতত্র যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

খুনের মামলার আসামী নিবারণ রায়ের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। আসামী এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনরা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। নিবারণ দিনরাত কেবল ডেকে যাচ্ছেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে — 'বাবা! রক্ষা কর! আমাকে বাঁচিয়ে দাও!'

ব্যাকুল প্রার্থনায় সাড়া দিলেন লোকনাথ। বন্ধ কারাগার, বাইরে সশস্ত্র প্রহরী। হঠাৎ কারাগারে, নিবারণের সামনে দীর্ঘকায়, জ্যোতির্ময় লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

— 'কে আপনি?' বিস্মিত আসামীর প্রশ্ন।

— 'তোর মামলার রায় লিখিয়ে দিয়ে এলুম।'

— 'মামলার রায়?'

—'হ্যারে। তুই খালাস হয়েছিস।'

বিস্ময়ে, আনন্দে, উত্তেজনায় নিবারণ কাঁপছেন। জিজ্ঞেস কলেন — 'কিন্তু বাবা, আপনি কে?'

— 'আমাকে চিনতে পারলি না? আমি বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী।'

পরদিনই নিবারণ ডাক মারফৎ জানতে পারলেন যে তিনি খুনের অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েছেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ড রদ হয়েছে।

স্বামী দিব্যানন্দ এই ঘটনার উল্লেখ করে জানাচ্ছেন — 'ব্যাপারটা যখন ঘটে লোকনাথ বাবা কিন্তু তখন আর নরদেহে নেই, কিছুকাল আগে তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

★★★

বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়ের ইচ্ছে যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। গুরুর সন্ধানে তিনি এলেন লালগোলায় সত্যদ্রষ্টা যোগী বরদাচরণ মজুমদারের কাছে। বরদাচরণ ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং সংসারী মানুষ। কিন্তু গৃহী হয়েও তিনি ছিলেন

মহাসাধক। দিলীপকুমার রায়কে তিনি সামনে রেখে ধ্যানে বসলেন এবং ধ্যানভঙ্গের পর বললেন যে দিলীপের গুরু শ্রীঅরবিন্দই।

দিলীপ বললেন যে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে এখনও তাঁর দীক্ষা নেবার সময় হয়নি। বরদাচরণ হেসে বললেন -- 'তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) আমাকে এইমাত্র বলে গেলেন -- আপনার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে -- ওকে মানা কর অন্য গুরু বরণ করতে, সময় হলেই আমি ডেকে নেব ওকে।'

বরদাচরণ বললেন -- 'বিশ্বাস হয় না, এই তো? তবে আমি যে সত্যবাদী তার একটা প্রমাণ চান আপনি -- এই না?' এই বলে তিনি দিলীপকুমারকে চমকে দিয়ে বললেন --। আপনার ডানদিকের তলপেটে কি হার্নিয়া আছে?'

দিলীপ শুনে থ! জিজ্ঞেস করলেন তিনি একথা যোগবলে জেনেছেন কিনা।

বরদাচরণ বললেন, 'একথা জানলাম শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনেই। তিনি বললেন, 'দিলীপ আমাকে লিখেছিল ওর হার্নিয়ার কথা। আমি ওকে লিখেছিলাম অপারেশন করাতে। অপারেশনের পরেই ওকে ডেকে নেব।'

দিলীপ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে ঐ কথাগুলিই লিখেছিলেন।

★★★

অফিসের ইংরেজ বড়বাবু কিছুদিন ধরেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শ্যামাচরণ এর কারণ জিজ্ঞেস করতে সাহেব জানালেন যে স্বদেশে তাঁর স্ত্রী প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। অনেকদিন ধরে বাড়ি থেকে কোন চিঠিপত্রও আসছে না।

শ্যামাচরণ সাহেবকে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, আমি আজই খবর এনে দেব।' এই বলে তিনি অফিসের এক নির্জন ঘরে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যান শেষ হবার পর তিনি বিমর্ষ সাহেবকে বললেন, 'আপনার স্ত্রী ভালো হয়ে গেছেন। এমনকি তিনি আপনাকে চিঠিও লিখছেন।' কি লিখেছেন তা-ও তিনি জানালেন।

কিছুদিন পরেই সাহেব তাঁর স্ত্রীর চিঠি পেলেন। চিঠির বিষয়বস্তু শ্যামাচরণ যা বলেছিলেন হুবহু তার সঙ্গে মিলে গেল।

তারপর একদিন স্বয়ং মেম সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তো শ্যামাচরণকে দেখে অবাক! সাহেবকে বললেন -- এঁকেই আমি আমার রোগশয্যার পাশে দেখেছি, আর এর কৃপাতেই আমি ভালো হয়ে গেছি।'

এই শ্যামাচরণ আর কেউ নন বিখ্যাত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

★★★

সমুদ্রপথে জাহাজে করে ক্লেম্‌সেল থেকে ফিরছিলেন মীরা রিশার, পরবর্তীকালে যিনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া 'মাদার' বা শ্রীমা হিসাবে বিখ্যাত হন। হঠাৎ সামুদ্রিক ঝড়। উত্তাল হয়ে উঠল সমুদ্রের ঢেউ, ঢেউয়ের প্রচণ্ড দাপটে জাহাজ প্রায় ডুবুডুবু। যাত্রীদের অবস্থা শোচনীয়। ভয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন মঁসিয়ে তেঁও। তিনি শ্রীমাকে ঐ উত্তাল তরঙ্গ থামিয়ে দিতে বললেন।

শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তারপর নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দেখলেন অসংখ্য অশরীরী আত্মা জাহাজটাকে ধরে দোলা দিচ্ছে, তারই ফলে এই বিপত্তি। শ্রীমা বলছেন 'আমি নম্রভাবে খুব মিষ্টি করে তাদের বুঝিয়ে বললাম, এইসব ভয়-কাতর নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে তোমাদের লাভটা কি হচ্ছে। ও-সব ছেড়ে দাও, এদের নিষ্কৃতি দাও। ... শেষে তারা তুষ্ট হয়ে এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত হলো, সমুদ্রের জলও তখন শান্ত হয়ে গেল। আমি আবার আমার দেহে ফিরে এলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখি, ঝড় থেমে গেছে, যাত্রীরা আনন্দে কোলাহল করছে।'

মহাসাধিকা শ্রীমায়ের এই রকম অসংখ্য যোগ-বিভূতি ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা আজ আর কারও অজানা নেই।

★★★

অলৌকিক ক্ষমতা স্বামী বিবেকানন্দেরও ছিল। কিন্তু যেখানে সেখানে সেইসব ক্ষমতা তিনি দেখাতেন না। তাঁর এই ক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন শান্তিরাম। হঠাৎ তিনি গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। তাঁর জীবন সংশয় দেখা গেল। আত্মীয় স্বজনরা উদ্বিগ্ন। শান্তিরামের মা স্বামীজীকে ধরলেন যাতে তাঁর পুত্র সুস্থ হয়ে ওঠে। স্বামী সারদানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দ একটা বাটি করে গঙ্গাজল আনতে বললেন। গঙ্গাজল নিয়ে আসার পর, তিনি কিছুক্ষণ ঐ জলের দিকে চেয়ে রইলেন। সারদানন্দ জানাচ্ছেন, 'আশ্চর্য! জলটা গরম হয়ে তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। তিনি বললেন, 'যাও ওকে খাইয়ে দাও একটু একটু করে। বাকি যেটা থাকবে, ঘরে রেখে দিও। বাড়ির কারুর শক্ত ব্যারাম হলে ব্যবহার করবে।"

★★★

পরিব্রাজনে বেরিয়েছেন এক সন্ন্যাসী। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন মধ্যভারতের ভূপালতান সরোবরের কাছে।

সরোবরের ওপারে মুসলমান নবারের দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ। এই সেই রক্তচক্ষু নবাব যিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর প্রাসাদের কাছে কেউ শাঁখ বা ঘন্টা বাজাতে পারবে না। যে এই আদেশ অমান্য করবে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে। ফলে ঐ এলাকায় বন্ধ হয়ে গেল হিন্দু ভক্তদের শাঁখ ও ঘন্টা বাজানো।

সন্ন্যাসী ঐ সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে খুব জোরে শাঁখ বাজাতে লাগলেন। কাছাকাছি যেসব হিন্দুরা বাস করত তারা চমকে উঠল। আর ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন স্বয়ং নবাব। প্রহরীদের ডেকে বললেন -- কে শাঁখ বাজাচ্ছে? কার এই দুঃসাহস যে আমার আদেশ অমান্য করে? যাও তোমরা, এখুনি ধরে নিয়ে এসো লোকটাকে।

প্রহরীরা সরোবরের কাছে গিয়ে দেখল এক হিন্দু সন্ন্যাসী শাঁখ বাজাচ্ছেন। তারা ফিরে গিয়ে নবাবকে সে কথা জানাল।

নবাব তো রেগে আগুন! এক সামান্য হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁর আদেশ অমান্য করছেন! তিনি হুকুম দিলেন -- 'তার মাথা কেটে নিয়ে এসো অথবা তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।

সাধুকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে আবার তারা ছুটে এলো। এসে দেখল সাধুটি নেই। সেখানে পড়ে রয়েছে তাঁর ছিন্ন শির ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

নবাব সব শুনে খুশি হলেন। যাক! আর শঙ্খধ্বনি শুনতে হবে না! হিন্দু সাধু উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে!

কিন্তু হঠাৎ মিলিয়ে গেল নবাবের হাসি। ঐ তো শোনা যায় শঙ্খধ্বনি। অবিরাম বাজছে। আবার ছুটে এলো প্রহরীরা। এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। এমন কি সেই ছিন্ন শির ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পর্যন্ত নেই।

প্রহরীদের মুখে এই কথা শুনে নবারের কপালে পড়ল চিন্তার রেখা। মনে হচ্ছে ইনি কোন সাধারণ সাধু নন, নিশ্চয় কোনো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাযোগী! তিনি মন্ত্রীদের ডাকলেন এবং সবকিছু জানালেন। সকলে মিলে এলেন সরোবরের কাছে। দেখলেন ভূপালতানের পাড়ে বসে রয়েছেন এক জটাজুটধারী জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী - দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। নবাব সন্ন্যাসীকে যথারীতি অভিবাদন করলেন। সন্ন্যাসী বললেন -- কারও ধর্মে আঘাত করা উচিত নয়। হিন্দুদের ধর্মের অঙ্গ হল শাঁখ আর ঘন্টা বাজানো। এটা আপনি বন্ধ করতে পারেন না। আপনাদের আদেশ আপনি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিন।

নত হল নবাবের রক্তচক্ষু। তিনি নতমস্তকে সন্ন্যাসীর আদেশ মেনে নিলেন।

এই সন্ন্যাসী হলেন মহাশক্তিধর যোগিপুরুষ দেবদাস কাঠিয়াবাবা। রামদাস কাঠিয়াবাবার গুরুদেব।

★★★

বরদার রাণী যমুনাবাঈ -এর আমন্ত্রণে গাড়ি করে যাচ্ছে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সঙ্গে তাঁরই প্রিয় শিষ্য বালানন্দ ব্রহ্মচারী।

বাজারের কাছে আসতেই এক ভক্তের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের দেখা হয়ে গেল। গাড়ি থামিয়ে সে ব্রহ্মানন্দের ঝুলিতে তার ক্ষেতের একগাদা শাকসবজী দিয়ে দিল। গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

রাণী যমুনাবাঈ যথারীতি তাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন করলেন, তারপর ব্রহ্মানন্দজীর ঝুলির দিকে চোখ পড়তেই সকৌতুক মন্তব্য করলেন ঃ বাবাজীর ঝুলি যে ভর্তি। আজ আমাদের ভাগ্য ভালো, বাবাজী আমাদের জন্যে অনেক ভালো ভালো জিনিস এনেছেন!

হাসলেন গঙ্গোনাথের অন্নপূর্ণা সিদ্ধ মহাযোগী - বেশ তো, বলো না তোমরা কি খেতে চাও?

রাণী বললেন, আমাদের আঙুর খাওয়ান।

তখন আঙুরের সময় নয়। রাণী বোধহয় ঐজন্যেই আঙুরের কথা বললেন। হয়তো ভেবেছিলেন, বাবাজীর ঝুলি থেকে অসময়ের ফল বেরুনো সম্ভব নয়।

ব্রহ্মানন্দজী তাঁর ঝুলির মধ্যে হাত ঢোকালেন এবং রাণীর হাতে তুলে দিলেন একগোছা আঙুর।

রাণী অসময়ের আরও কিছু ফল চাইলেন। ব্রহ্মানন্দজী ঝুলি থেকে সেগুলি বার করে দিলেন।

বিস্মিত হলেন রাণী, বিস্মিত হলেন. শিষ্য বালানন্দজী। পরে বালানন্দজী জেনেছিলেন যে তাঁর গুরুজীর 'ঝুলিটি ছিল ঋদ্ধি ও সিদ্ধিতে ভরা।'

ভক্তশ্রেষ্ঠ তিরুপ্পান

তামিলনাড়ুর ত্রিচিনাপল্লীতে অবস্থিত 'দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বিশাল ও বিস্তৃত মন্দির শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু মন্দির। এর তোরণটি ন'তলা, এটি একশ চৌষট্টি ফুট উচ্চ। মন্দিরের শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ আসলে বিষ্ণুর। এটি শেষ শয্যায় শায়িত দশহাত দীর্ঘ, নীল পাথরে তৈরী বিষ্ণুমূর্তি। .... মন্দিরের প্রাচীরের বেড় দু'মাইল, এত বড় বিস্তৃত দেউল আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দিরটির আকার ওঁকারবৎ , চূড়ায় চারটি সোনার কলস, চারটি বেদের প্রতীক (ভারত সংস্কৃতির রূপরেখা)।

এই পবিত্র মন্দিরের বিগ্রহকে স্নান করাবেন বলে কাবেরী নদী থেকে কলসী করে জল নিয়ে এসেছেন পূজারী। কিন্তু মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পূজারী বিস্মিত হলেন। রোজই তিনি বিগ্রহকে স্নান করিয়ে দেন, কোনদিন তো মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়নি!

তিনি দরজায় ধাক্কা দিলেন, চিৎকার করে বললেন -- দরজা খোলো। কে ভেতরে আছো? দরজা খুলে দাও।

ভেতর থেকে কোন উত্তর এল না। উৎসুক ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভীড় বাড়তে থাকে। পূজারীর সঙ্গে তাঁদের অনেকে দরজা খোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তবু রুদ্ধ থাকে মন্দিরের কপাট।

তবে কি রুষ্ট হয়েছেন শ্রীরঙ্গনাথজী? কিন্তু কি এমন কারণ ঘটল যার জন্যে ঈশ্বরের এই রোষ?

পূজারীর চোখে জল, মনে উৎকণ্ঠা। ব্যাকুলভাবে এবার তিনি রঙ্গনাথজীর উদ্দেশ্যে বললেন প্রভু, যদি কোন অন্যায় অপরাধ হয়ে থাকে, তারজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। মন্দিরের দরজা খুলে দিন প্রভু!

অকস্মাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে দৈববাণী হল। শ্রীরঙ্গনাথজী বললেন -- আমার পরম ভক্তকে পূজারী আজ চরম অপমান করেছে। পাথর ছুঁড়ে তার মাথা ফাটিয়ে

দিয়েছে, তার রক্তে সিক্ত হয়েছে ত্রিচিনাপল্লীর মাটি। তাই রুদ্ধ হয়েছে মন্দিরের দ্বার। পূজারীর আনা জল আমি গ্রহণ করব না।

পূজারী অনুতপ্ত হলেন। ব্যথিত কণ্ঠে স্বকৃত অপরাধ স্বীকার করে তাঁর পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানতে চাইলেন।

আবার শোনা গেল দৈববাণী - আমার ঐ পরম ভক্তের পায়ে পড়ে তার কাছে তুমি ক্ষমা চাও। তাকে এখুনি কাঁধে করে নিয়ে এসে মন্দির প্রদক্ষিণ কর। তারপর তাকে আমার মূর্তির পাশে বসাও। সেটাই হবে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পূজারী গোঁড়া ব্রাহ্মণ। কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান সেবক তিনি। আর ঐ ভক্ত জাতিতে পৈরেয় -- অপবিত্র, অস্পৃশ্য, অশুচি বলে উচ্চবর্ণের মানুষ তাদের অত্যন্ত ঘৃণা করে।

কাবেরী নদীর জলে শ্রীরঙ্গনাথজীর বিগ্রহকে স্নান করানো হয়। যে সপ্তনদীকে ভারতবর্ষে সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করা হয়, কাবেরী তাদের অন্যতম। অন্য নদীগুলি হল -- গঙ্গা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী, যমুনা ও সরস্বতী --

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু।।'

এহেন পবিত্র নদীর তীরে বসে আছেন ঐ অস্পৃশ্য, পৈরেয় ভক্ত। কী স্পর্দ্ধা! বিশ্বসংসার ভুলে তিনি আবার বীণা বাজিয়ে গান গাইছেন! এটাই তাঁর আনন্দ। সুরে সুরে তিনি ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করতে চান। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ বলে মানুষের কাছ থেকে তিনি শুধু ঘৃণা আর অবহেলাই পেয়ে আসছেন। ঠাকুরের সেবা করার অধিকার পর্যন্ত তাঁর নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে দূর থেকে তাঁকে ঠাকুর দর্শন করতে হয়। মনে আশা, একদিন হয়তো করুণাময় ঈশ্বরের করুণাধারা তাঁর ওপর বর্ষিত হবে। মনে প্রাণে রঙ্গনাথজীর এতবড় নিষ্ঠাবান ভক্ত আর নেই।

নদীতীরে একজন পৈরেয়কে বসে থাকতে দেখে মহা ক্রুদ্ধ হলেন পূজারী। উত্তেজিতভাবে তিনি তাঁকে ঐ স্থান থেকে উঠে যেতে বললেন।

কিন্তু পূজারীর কথা তাঁর কানে গেল না। কি করেই বা যাবে? ঈশ্বরের ভাবে, ঈশ্বরের চিন্তায় যিনি নিবিষ্টচিত্ত, তাঁর কর্ণকুহরে কি অন্য কথা প্রবেশ করতে পারে?

চিৎকার করে উঠলেন পূজারী -- পৈরেয়, তুই এখুনি উঠে যা। আমি ঠাকুরের স্নানের জল আনতে যাচ্ছি। এই নদীর তীর তুই অপবিত্র করিস নি।

পূজারী চিৎকার করে ভর্ৎসনা করছেন, তবু হুঁশ নেই ভক্ত গায়কের। নীচ জাতির এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, মন্দিরের পূজারী, আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা! ক্রোধে জ্বলে উঠে ঐ পৈরেয়কে পূজারী পাথরের টুকরো দিয়ে সজোরে মারলেন। মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল ভক্তের।

ভাবজগৎ থেকে মুহূর্তের মধ্যে তিনি কঠোর বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। দেখলেন, কলসী হাতে দাঁড়িয়ে আছেন পূজারী। অশুচি ভক্ত বসে আছেন বলে তিনি জল নিতে পারছেন না।

কুণ্ঠিত হয়ে পূজারীর কাছে বার বার তিনি ক্ষমা চাইলেন। না বুঝে তিনি যে অন্যায় করেছেন,. তারজন্যে তিনি সত্যিই অনুতপ্ত।

কিন্তু শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ক্ষমা করলেন না, বরং নানা কটূক্তি করতে লাগলেন তাঁকে। দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন ভক্ত পৈরেয়।

পূজারী নদী থেকে জল নিয়ে মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ।

ভক্তকে আঘাত করে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন পূজারী। তাই রুষ্ট হয়েছেন রঙ্গনাথজী। তাঁর ক্রোধ উপশমের জন্যে অনুতপ্ত পূজারী ছুটলেন পৈরেয় পল্লীতে -- যা অভাবনীয়। পল্লীতে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজারী আজ তাদের পল্লীতে!

পূজারীকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সেই ভক্ত বীণাবাদক। পূজারী লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

-- একি করছেন ঠাকুর! আমার যে মহা পাপ হবে! আমি অস্পৃশ্য!

-- আমাকে ক্ষমা করো ভাই।

-- বলেন কি ঠাকুর! ক্ষমা তো আমারই চাওয়া উচিত। অন্যায় তো আমিই করেছি।

- আমি তোমাকে মন্দিরে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাকে আঘাত করেছি বলে মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে রঙ্গনাথজী বন্ধ করে দিয়েছেন। তুমি ক্ষমা করলে তবেই আমি পাপমুক্ত হবো। না করলে মন্দিরের দরজা খুলবে না, রঙ্গনাথজীও আমার আনা জল স্পর্শ করবেন না।

ভক্তকে কাঁধে চাপিয়ে পূজারী মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁকে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন।

মন্দিরের দরজার সামনে ভক্ত দাঁড়াতেই বন্ধ দরজা খুলে গেল। উচ্ছ্বসিত জনতা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। ভক্তের নামে তারা জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

মন্দিরে প্রবেশ করলেন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষটি। জীবনে প্রথম এখানে প্রবেশাধিকার পেলেন। আবেগে, আনন্দে তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে। পূজারীর অনুরোধে তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বিগ্রহের পাশে বসলেন।

ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান রঙ্গনাথজী স্বরূপে তাঁর সামনে আর্বিভূত হলেন। ভগবানের চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রু।

রঙ্গনাথজী বললেন -- বলো, কি বর চাও?

-- কিছু চাইনা প্রভু। আপনি যে দয়া করে আমায় দর্শন দিয়েছেন। আর কি কিছু চাইবার থাকতে পারে?

-- শত দুঃখ-কষ্ট-অপমান সহ্য করেও আমার প্রতি তোমার ভক্তি অবিচল থেকেছে। আজ থেকে এই মন্দিরে, আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসাবে তোমারও ঠাঁই হবে।

রঙ্গনাথজী তাঁর গলা থেকে মালা খুলে ভক্তশ্রেষ্ঠকে পরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বন্ধ কপাট।

বাইরে অগণিত ভক্তের বাঁধভাঙা আনন্দ ও জয়ধ্বনি।

অস্পৃশ্য, নীচ বংশজাত এই অতুলনীয় ভক্ত হলেন তিরুপ্পান।

ঈশ্বর ভজনায় প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। উচ্চবশে না জন্মেও বহু সাধক মানুষকে শুনিয়েছেন চিরন্তন সত্যের বাণী। কবীর ছিলেন জোলা, রবিদাস চর্মকার, সেনা নাপিত, বামদেব দর্জিপুত্র, রজ্জব ও দাদূ মুসলমান, আর তিরুপ্পান অস্পৃশ্য। কিন্তু এঁদের জীবনাদর্শ ও বাণী কালজয়ী, অগণিত মানুষের চিরন্তন প্রেরণা।

গুরু যাদবপ্রকাশ ও আচার্য রামানুজ

কাঞ্চীপুরের স্বনামধন্য অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত হলে কি হবে, আচার্য যাদবপ্রকাশ কিন্তু সদ্‌গুরু ছিলেন না। সদগুরু কেন, আদৌ কি তিনি গুরু হবার যোগ্য ছিলেন?

যাদবপ্রকাশের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন ঈর্ষাকাতর, ক্ষুদ্রমনা, অনুদার। শিষ্যকে খুনের চক্রান্ত করতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

যাদবপ্রকাশের অন্যতম শিষ্য রামানুজ ছিলেন গুরুর বিপরীত। তিনি ছিলেন ধীর, স্থির, নম্র, বিনয়ী, উন্নতমনা এবং নিরহঙ্কার। অসাধারণ মেধাবী এই শিষ্যটির গুরুভক্তিও ছিল প্রশংসনীয়।

যাদবপ্রকাশ পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হলেও তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা অনেক সময় রামানুজের পছন্দ হত না। কিন্তু তা নিয়ে গুরুর সঙ্গে কোনদিনই তর্ক বিতর্ক করতেন না। চুপ করে থাকতেন। কিন্তু একদিন তিনি গুরুর শাস্ত্র ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশ্য প্রতিবাদের ভাষা ছিল সংযত।

রামানুজ একদিন গুরুসেবা করছেন, একটি ছাত্র এসে যাদবপ্রকাশকে বলল — গুরুদেব, ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি পংক্তির মানেটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আপনি একটু বুঝিয়ে দেবেন?

— পংক্তিটি কি?

— আজ্ঞে 'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী'। যাদবপ্রকাশ বললেন — সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যায়, এখানে তাঁর চোখদুটির কথা বলা হচ্ছে। ঐ চোখদুটি বানরের পশ্চাদভাগের মতো যে লোহিতাভ পদ্ম তার মতো।

গুরু মুখে শ্লোকটির এই আক্ষরিক ব্যাখ্যা শুনে রামানুজ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। যিনি স্বয়ং ত্রিলোকপতি, তাঁর চোখ দুটির সঙ্গে বানরের পশ্চাদভাগের তুলনা! দুঃখে তার চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

শিষ্যের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে যাদবপ্রকাশ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন -- কি হয়েছে রামানুজ?

নম্র কণ্ঠে রামানুজ বললেন -- গুরুদেব, অপরাধ নেবেন না।কপ্যাসং কথার যে ব্যাখ্যা আপনি করলেন, আমার মনেহয় তা সঠিক নয়। এই ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা এবং জগৎপিতার পক্ষে অমর্যাদাকর (শ্রদ্ধেয় স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই পংক্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে - 'উক্ত পুরুষের চক্ষুর সহিত মর্কটের অধোভাগের তুলনা করিয়া অশ্রদ্ধা দেখানো হইল -- এইরূপ বলা যাইতে পারে না)।

শিষ্যের কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন যাদবপ্রকাশ। জিজ্ঞেস করলেন -- বটে! তাহলে সঠিক ব্যাখ্যাটা কি?

-- আজ্ঞে, আমার মনে হয়, ঐ পংক্তিটির অর্থ -- সেই বিরাট পুরুষের নয়নদুটি সূর্য-বিকশিত পদ্মের মতো।

তরুণ শিষ্যের ব্যাখ্যা শুনে রীতিমত ঈর্ষান্বিত হলেন যাদবপ্রকাশ। তবু 'লোক দেখানো' প্রশংসা করে বললেন -- তুমি অবশ্য পংক্তিটির গৌণ অর্থ করেছো। তা হোক, তোমার ব্যাখ্যার আমি প্রশংসা করছি।

কাঞ্চীর রাজকন্যার ওপর এক প্রেতাত্মা ভর করেছে। রাজা অনেক চিকিৎসক দেখিয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে ভালো করতে পারেনি। অগত্যা তিনি যাদবপ্রকাশের শরণাপন্ন হলেন। মনে আশা, এই অদ্বৈতবাদী নিশ্চয়ই তাঁর মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবেন।

রামানুজ ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে যাদবপ্রকাশ রাজকন্যাকে দেখতে গেলেন। রাজকন্যার ওপর ভর করা প্রেত রামানুজকে দেখেই বলে উঠল -- ইনি যদি আমার মাথায় একবার পা রাখেন তাহলেই আমি রাজকন্যাকে ছেড়ে চলে যাবো।

যাদবপ্রকাশ ভাবলেন -- আমি থাকতে রামানুজকে ডাকলো! ঈষাতুর, গুরুদেব তবু শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন -- যাও, রাজকন্যার মাথায় পা রাখো।

রামানুজ রাজকন্যার মাথায় পা ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেত চলে গেল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন রাজকুমারী। রামানুজের নাম যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শিষ্যের ওপর গুরুর ভালোবাসা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছিল। শিষ্যের নাম যশ যতই ছড়িয়ে পড়ছে ততই হিংসায় জ্বলে যাচ্ছেন যাদবপ্রকাশ। শেষে গুরুর চতুষ্পাঠী

থেকে রামানুজকে বহিষ্কার করা হল। রামানুজকে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন তাঁর গুরুদেব।

কুচক্রী যাদবপ্রকাশ ঠিক করলেন তিনি শিষ্যদের নিয়ে তীর্থ পরিক্রমা করবেন এবং রামানুজকেও সঙ্গে নেবেন। রামানুজ যেতে রাজী হলেন। সরলপ্রাণ, নিষ্পাপ রামানুজ যাদবপ্রকাশের হীন ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতেই পারলেন না।

সশিষ্য যাদবপ্রকাশ পরিভ্রমণ করতে করতে এক দুর্গম অরণ্যে এসে পৌঁছলেন। শিষ্যদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করে তিনি ঠিক করলেন, আর দেরী না করে আজই রামানুজকে হত্যা করা হবে। শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন রামানুজের মাসুতুতো ভাই গোবিন্দ। তিনি চুপি চুপি এক ফাঁকে রামানুজকে তাঁর গুরুদেবের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিলেন। তারপর তাঁকে এখনই এখান থেকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে গেলেন রামানুজ। এদিকে, তাঁকে দেখতে না পেয়ে সবাই ভাবলেন হয় তাঁকে বাঘে নিয়ে গেছে, নয়তো কোনো জলাশয়ে তিনি ডুবে গেছেন।

পথের কাঁটা সরে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন উৎফুল্ল যাদবপ্রকাশ।

এরপর অতিবাহিত হয়েছে কয়েকটা বছর। রামানুজ সন্ন্যাস নিয়েছেন, 'যতিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, নির্বাচিত হয়েছেন কাঞ্চীপুরের মঠাধ্যক্ষরূপে। তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাঁকে দর্শন করবার জন্যে, তাঁর উপদেশামৃত শোনবার জন্য দলে দলে নরনারী আসতে লাগল।

একদিন এলেন যাদবপ্রকাশের মা, সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত পুত্র। রামানুজকে বৃদ্ধা অনুরোধ করলেন -- বাবা, আমার ছেলেকে তোমার শিষ্য করে নাও।

যাদবপ্রকাশের অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই দম্ভ ও অহঙ্কার আর নেই। রামানুজ তাঁর প্রাক্তন গুরুকে শিষ্যরূপে গ্রহণ কলেন, আর প্রাক্তন শিষ্যের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন যাদবপ্রকাশ!

এ কে নজিরবিহীন ঘটনা।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত

সাধক কবি রামপ্রসাদ আর কবি সাধক কমলাকান্ত । অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের দুই প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র। দুজনেই তন্ত্রসাধক, মাতৃপ্রেমে উন্মত্ত। দুজনেই অসামান্য গীতিকার-সুরকার-গায়ক। দুজনের মুখেই শ্যামাসঙ্গীত শুনে অভিভূত হয়েছেন রাজামহারাজা থেকে শুরু করে কাঙাল পর্যন্ত সবাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শোনা যেত এঁদের গান। রামপ্রসাদের 'মন রে কৃষি কাজ জান না', 'আয় মন বেড়াতে যাবি', 'ডুব দে রে মন কালী বলে', 'এবার কালী তোমায় খাব', 'আমি সুরা পান করি না', আর কমলাকান্তের 'আপনারে আপনি দেখ', 'সদা আনন্দময়ী কালী', 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' প্রভৃতি গান পরমহংসদেব যখন গাইতেন, তখন এক স্বর্গীয়পরিবেশ সৃষ্টি হত এবং গাইতে গাইতে তিনিও ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতেন। আজকের এই হিংসা, অবিশ্বাস আর সার্বিক অবক্ষয়ের যুগেও এই দুই মহাসাধকের গান স্বমহিমায় আজও ভাস্বর। জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত, হতাশ বাঙালী এঁদের গান শুনে দু'দণ্ড শান্ত পায়।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত দুজনেই গৃহী সাধক। দুজনেই আবাল্য শ্যামা মায়ের পরম ভক্ত, নির্লিপ্ত ও উদাসীন। দুজনেরই কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয় কৈশোরে। গুরুজনদের চাপে দুজনকেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর কমলাকান্তকে আবার বিবাহ করতে হয়। কিন্তু কে কবে মাতৃপাগল বৈরাগীকে সংসারে ধরে রাখতে পেরেছে! দুজনেরই সংসারে আসক্তির পরিবর্তে দেখা গেল তীব্র অনাসক্তি আর বৈরাগ্য। কিন্তু এঁরা তো আর গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নন। তাই সংসার চালাবার কথাও এঁদের ভাবতে হয়। রামপ্রসাদের মতো মহাসাধককেও তাই জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তায় সামান্য একটা চাকরী নিতে হয়। উদাসী রামপ্রসাদের কি আর চাকরী করতে ভালো লাগে? হিসেবের খাতায় একদিন তিনি লিখলেন -- 'আমায় দাও মা তবিলদারী / আমি নিমকহারা নই শঙ্করী।' গুণগ্রাহী ধর্মপ্রাণ জমিদার তাঁকে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে সাধনভজনে আত্মনিয়োগ করতে বললেন। শুরু হল তাঁর কালী মাতার একনিষ্ঠ সাধনা। শ্যামা মায়ের দর্শন লাভের বাসনায় দুজনেই করেছেন

কঠোর সাধনা, আয়ত্ত করেছেন নানা যৌগিক প্রক্রিয়া ও তন্ত্র সাধনার গূঢ় রহস্য। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন দুজনেই। মহাকালীর দর্শন পেয়ে কমলাকান্ত গাইলেন --

'কালি! জগমনোমোহিনী এলোকেশী
তোমায় সবাই বলে কালো কালি
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।'

আর রামপ্রসাদ গাইলেন --

'তাই কালোরূপ ভালবাসি
কালো জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী।'

কমলাকান্ত ছিলেন তাঁরই শিষ্য বর্ধমানরাজ তেজেশচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। ভোগবিলাসের আবহাওয়ায় থেকেও তিনি নিভৃতে কঠোর সাধনা করেছেন। রাজসভার ঐশ্বর্য - আড়ম্বর তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি।

দুই কবিই অল্পাধিক তিনশো গান রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ ভাবুক। তিনি তাঁর গান গুলিকে সচেতনভাবে শিল্পরূপ দান করেন নি। কিন্তু কমলাকান্তের গানে রয়েছে পরিশীলিত শিল্পরূপ। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় দুজনের গানকেই বিশিষ্টতা দান করেছে। তাই তাঁদের গানের এত কদর।

তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও রামপ্রসাদ সকল সম্প্রদায়কেই শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে মহাসমন্বয়ের অমৃতবাণী -- 'এই যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম -- সকল আমার এলোকেশী।' ভেদাভেদ নয়, মনকে দুঃখমুক্ত করাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট -- 'ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।'

রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তও শ্যাম-শ্যামার অভিন্নতা প্রতিপাদন করে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন --'কালী কেবল মেয়ে নয় / মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ/ কখন কখন পুরুষ হয়।'

নীরবে ধর্মসাধনার অপূর্ব পথনির্দেশ দিয়েছেন দুজনেই। কমলাকান্ত গেয়েছেন -

'আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে
যা চাইবে ঐখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

মানস পূজার ওপর রামপ্রসাদও গুরুত্ব দিয়েছেন। বাহ্যিক আড়ম্বর নয়, নিভৃতে হৃদয়ের সিংহাসনে জগজ্জননীকে স্থাপন করে অশুভ রিপু-অসুরকে বলি দেওয়ার

মধ্যেই থাকে মাতৃ-আরাধনার সার্থকতা। সহজ কথায় তিনি মাতৃ পূজার নির্দেশ দিয়েছেন --

'জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে
তুই লুকিয়ে তারে করবি পূজা
জানবে না রে জগজ্জনে।'

শোনা যায় স্বয়ং মা কালী কবি কন্যার রূপ ধারণ করে তাঁর বাগানের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। কমলাকান্ত সম্বন্ধেও জনশ্রুতি আছে -- দেবী কালিকা বাগ্‌দিনীর বেশে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মতো রামপ্রসাদও যুগের হাওয়া সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারেননি। রাজার মনোরঞ্জনের জন্যে তাঁকেও লিখতে হয় আদিরসাত্মক 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। কিন্তু রাজসভার পরিমণ্ডলে থাকা সত্ত্বেও কমলাকান্তের রচনায় বিন্দুমাত্র স্থূলতা দেখা যায়না।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত -- দুজনেই 'আগমনী' ও'বিজয়া'র গান রচনা করেছেন। এগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গিরিরাজ, মেনকা, উমা, শিব প্রভৃতি দেবদেবী এই কবিদ্বয়ের লেখনীতে বাঙালীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। রামপ্রসাদের 'গিরি, এবার আমার উমা এলে/ আর উমা পাঠাব না,' 'আজি শুভনিশি পোহাইল তোমার' এবং কমলাকান্তের 'কে বলে মা দরিদ্র হর', 'হে শিব শঙ্কর, তব অনুমতি হর', 'মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি' প্রভৃতি উমাসঙ্গীতের মানবিক আবেদন চিরন্তন।

শ্যামাসঙ্গীত যেন 'জরাব্যাধি-বিধ্বংসি ভেষজম্'। নির্মম দস্যু ও বিধর্মীর হৃদয়কেও এই সঙ্গীতসুধা ভক্তিরসে আর্দ্র করে। এক সন্ধ্যায় ডাকাতের হাতে পড়েছেন কমলাকান্ত। ডাকাত সর্দার যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত, তখন কবি সাধক তার কাছ থেকে জীবনের শেষ গান গাইবার অনুমতি চাইলেন। সর্দার অনুমতি দিতেই কমলাকান্ত হৃদয় নিংড়ে গাইলেন --' আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর/কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা'।

গান শুনে সর্দার আর অন্যান্য ডাকাত অভিভূত! কে এই ব্রাহ্মণ! কেন তাঁর গান শুনে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, জলে ভরে যায় দু'চোখ?

ডাকাতরা সসম্মানে কমলাকান্তকে মুক্তি দিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ একবার নৌকা করে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন আর গেয়ে যাচ্ছে শ্যামা সঙ্গীত। ঐসময় বজরায় জলবিহার করছিলেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা।

রামপ্রসাদের গান তাঁর কানে গেল। তিনি এত মুগ্ধ হলেন যে তিনি রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠিয়ে শ্যামাসঙ্গীত শুনতে চাইলেন। প্রসাদী সঙ্গীত নবাবের মনে গভীর রেখাপাত করল।

রামপ্রসাদ জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর সময়ে সারা দেশেই দেখা দিয়েছিল অরাজকতা, অনৈতিকতা, জমিদার ও পিয়াদাদের শোষণ ও অত্যাচার। কমলাকান্তের রচনায় সমাজ জীবনের এই দিকটি অনুপস্থিত। অন্যদিকে রামপ্রসাদের পদাবলীতে সমকালীন মানুষের ব্যথা বেদনার রূপটি বিশেষভাবে মূর্ত। 'মিঠার লোভে তিত মুখে' যাঁর 'সারা জীবন গেল', সেই রামপ্রসাদ সামাজিক বৈষম্যের অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর পদে --

'জানি গো জানি তারা, কেমন তব করুণা
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে
কারো পেটে ভাত গ্যাঁটে সোনা।।'
কিংবা

'করুণাময়ী, কে বলে তোরে দয়াময়ী?
কারও দুগ্ধেতে বাতাসা, আমার এমনি দশা।
শাকে অন্ন মেলে কই?
কারে দিলে ধন-জন মা, হস্তী-অশ্ব-রথ-চয়
ওমা, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেউ নই?'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনি শ্যামা মায়ের অভয় পদে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে দুঃখকে জয় করেছেন। ঐ রাঙা চরণদুটি আশ্রয় করেই 'আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে' বাস করেছেন কবি।

আমার শিক্ষক

আমি প্রাতঃকালীন পাঠ নিই চির নবীন নবোদিত সূর্যের কাছে। তিনি আমার তপন স্যার। তিনি ছাড়া আর কে অন্ধকারের ললাটে ছুঁইয়ে দেন 'অরুণ আলোর সোনার কাঠি?' তিনি ছাড়া আর কি কেউ দেবেন অস্তিত্ব রক্ষার সঞ্জীবনী মন্ত্র? তমসা থেকে জ্যোতির্লোকে উত্তরণের অভ্রান্ত পথনির্দেশ? বিনম্র ছাত্রের মতো তাই আমি নতজানু হয়ে এই মহান শিক্ষকের উদ্দেশে প্রণাম জানাই --

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

আমার জানলার পিছনে যে ছিমছাম নিমগাছটা ঝড়ের কুটিল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যার পাতায় পাতায় দোলায় দোলায় আনন্দ গান বেজে ওঠে, সে আমার নিমু স্যার। সে আমাকে শেখাবার চেষ্টা করে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ব্যাকরণ, আর মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবা সহজ পাঠ।

ন্যুব্জ দেহ কুব্জ পৃষ্ঠ নিরক্ষর পঞ্চু পোড়েল জুট মিলের পাশে চায়ের দোকান করে আজ স্বাবলম্বী। ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের পাশে থেকে তাদের সে বোঝায় -- 'তোমরা সবাই যদি মিলে মিশে এক হয়ে লড়াই করো, কে তোমাদের হারাবে?' প্রতিবন্ধী পঞ্চু স্যার আমাকে শেখায় রাজনীতির বর্ণপরিচয়।

আমার আর এক শিক্ষক তিন বছরের এক শিশু। সে আমার বড় আদরের খোকা-মাস্টার। আমি তার কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করি বিলুপ্তপ্রায় এক দুরূহ বিষয় -- সরলতা আর পবিত্রতা। শিখতে গিয়ে আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠি। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের থিয়োরী অব রিলেটিভিটি কি এর চেয়েও শক্ত বিষয়?

জীবনের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্তি আসে যখন, মন স্থবির হতে চায়, তখন আমি নির্জন নদীতীরে এসে দাঁড়াই। নদী আমার তটিনী দিদিভাই। তিনি আমায় শেখান, চলিষ্ণুতার স্বরলিপি -- 'চরৈবেতি, চরৈবেতি।'

সূর্যোদয়ের আগে

প্রভাসের আগে মাথুর। মিলনের আগে বিরহ। সিদ্ধির আগে সাধনা। ভূমি থেকে ভূমায় - সীমা থেকে অসীমে - রূপ থেকে অরূপে উত্তরণের জন্য চাই সুপ্তির মতো আকুলতা। মুক্তো তৈরীর আগে সাগরের নিঃসীম জলরাশির ওপর সুপ্তি ভেসে বেড়ায়। ভালো লাগে না সমুদ্রের কল্লোল, রাতের তারা ঝিলমিল আকাশের রাজ সমারোহ। সে শুধু উন্মুখ হয়ে থাকে, কবে কখন কোন এক সুন্দর মুহূর্তে স্বাতী নক্ষত্র থেকে ঝরে পড়বে নিটোল একবিন্দু জলকণা। সেই জলকণা বুকের গভীরে লুকিয়ে রেখে সুপ্তি চলে যায় সমুদ্রের তলদেশে। মুক্তো তৈরীর সাধনায় হয় মগ্ন চেতন। প্রতিটি সাধকের জীবনেই সিদ্ধির আগে আসে একটা তীব্র ব্যাকুলতা, বিষাদ আর বৈরাগ্য। পার্থিব ভোগসুখে বন্দী মন হঠাৎ শুনতে পায় অজানার আহ্বান। কালিন্দী নদীকূলে, গোকুলের গোঠে হঠাৎ বেজে ওঠে বংশীধ্বনি, আর ব্যাকুল হয়ে ওঠে শ্রীরাধার হৃদয়। ছোট্ট একটি শব্দ -- শ্যাম! সেই নাম মরমে প্রবেশ করে মন প্রাণ আকুল করে দেয় রাধিকার। কোনো কাজে মন লাগে না -- 'ঐদিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে।' ভালো লাগে না সং-সাজাই-সার সেই সংসারে থাকতে, যেখানে হৃদয়ের অনন্ত ক্ষুধা মেটে না, মেলে না 'তাপ হারা পিপাসার বারি --হৃদয়ের চির আশ্রয়'। কবে দেখা হবে সেই ব্রজকুল নন্দনের? নিসর্গ প্রকৃতিতে মহামিলনের ঐকতান -- 'কুলিশ শত শত পাত মোদিত, ময়ুর নাচত মাতিয়া।' কিন্তু এমন দিনে যারে বলা যায়, সেই ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দর কোথায়? কোথায় সেই সর্বতাপহর হৃদয়রঞ্জন? ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় মর্মভেদী হাহাকার – ঈ ভরা বাদর মাহ বাদর শূন্য মন্দির মোর।' ভাবসম্মিলনের আগে এভাবেই হতাশায়, শূন্যতায়, বেদনায় হৃদয় শতধাদীর্ণ হয়ে ওঠে। সমুদ্রে মিশে যাবার আগে নুনের পুতুলের এটাই ক্রম রূপান্তর। সূর্যোদয়ের আগে নিশ্চিদ্র তমসা।

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, বুদ্ধের মতোই সাজানো সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মহাবীর, গুরু নানক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং মেওয়ারের বাণী মীরাবাঈ। মাতৃস্নেহ উপেক্ষা করে দুর্গম পথের পথিক হয়েছিলেন আট বছরের বালক – শিবাবতার শঙ্কর। আচার্য শঙ্করের মতো আর একটি বালকও শুনেছিলেন অন্তরতমের নির্দেশ। মাত্র ন' বছর বয়সে সেই বালক সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বরণ

করেছিলেন কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ। আর তার ফলেই বালক পীতাম্বর পরিণত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী রূপে। 'সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে' 'সকাল বেলার সলতে' পাকানোর ইতিহাস অদম্য ব্যাকুলতা, সুতীব্র বিষাদ-বৈরাগ্য আর কঠোর সাধনার ইতিহাস।

'মা, তুই কোথায়? দেখা দে মা। একটি একটি করে দিন চলে যাচ্ছে -- তবু তুই দেখা দিচ্ছিস না!' মাটিতে মুখ ঘষে দিনের পর দিন কেঁদেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন সূর্যোদয় আর কখনই বা সূর্যাস্ত হত, টেরই পেতেন না। কি অদম্য আস্পৃহা, কি অননুকরণীয় ঐকান্তিকতা! স্ত্রীকে তিনটি পাগলামির কথা লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তার মধ্যে একটি হল -- 'ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে ..... তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার সংকল্প করিয়াছি।' একদিকে কঠোর সংকল্প, অন্যদিকে সুতীব্র অভীপ্সা। আশা নিরাশা দ্বন্দ্ব সংশয়ের কাঁটাপথ মাড়িয়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া -- ঊর্দ্ধের আলোর জন্য কেবল প্রতীক্ষা আর প্রার্থনা -- অবশেষে 'আমি'র তুমি' হয়ে ওঠা!

হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী। 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।' একটু শান্তির আশায় কত লোক পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কোনো শুভক্ষণে কেউ পেয়ে যান সদগুরু। কেউ বা কারো মুখের সামান্য একটি অর্থঘন কথা শুনে ঈশ্বর-অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, আমূল পরিবর্তিত হয় তাঁদের জীবন। বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস এবং লালাবাবুর জীবনে ছোট্ট একটি সরল বাক্য অসামান্য ব্যঞ্জনা বহন করে এনেছিল। শ্রীশ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনেও, ছোট্ট একটি প্রশ্ন আলোড়ন জাগিয়ে ছিল -- 'আমি কে? কোহহং?' এই প্রশ্নই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যোগসাধনার উচ্চতম মার্গে। তিনি পেয়ে ছিলেন তিনটি দুর্লভ বস্তু - মনুষ্যজন্ম, মুক্তির ইচ্ছা এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়। কিন্তু দুর্লভ 'ত্রিরত্ন' লাভের পরেও চাই জীবনের আমূল রূপান্তরের জন্য দুশ্চর তপস্যা। তা তিনি করেছিলেন এবং উন্নীত হয়েছিলেন ভূমা-পুরুষে।

সাধনার কথা পরে। তার আগে নিজেকে না জানার বেদনায় বুক মোচড় দিয়ে উঠুক। ডুবন্ত মানুষের মতো ব্যাকুল হয়ে উঠুক হৃদয়। দৈনন্দিন কাজকর্মের অবকাশে কত মানুষের শ্রান্ত ক্লান্ত মন হতাশায় ভেঙে পড়ে, ফিস ফিস করে উচ্চারণ করে 'আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি।' তারা আলোক-ভিক্ষু, কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হতে পারছে না সংসারের ভোগ সুখের যক্ষপুরী থেকে। অপেক্ষা করে আছে কখন একগুচ্ছ রক্তকরবী নিয়ে তাদের রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দেবে নন্দিনী, বলবে 'সময় হয়েছে, দরজা খোলো।' হয়তো তখন চৈতন্যের উদয় হবে। বুঝতে পারবে অন্তরের মধ্যেই রয়েছে নন্দনকানন, বৃথাই এতদিন তারা ঘুরে বেড়িয়েছে পরের বাগানে -- 'বাগো না জায়ে নাজা/তেরে কায়া মে গুলজার' (কবীর)।

নমি নমি চরণে ঃ-

সর্বশ্রী বালানন্দ-তারানন্দ-দেবানন্দ

(১)

উজ্জয়িনীর পীতাম্বর নামে ন বছরের এক বালক ব্রহ্মচারী উপনয়নের সময় দণ্ড আর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দণ্ডীঘর থেকে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি গৃহত্যাগ করে। আর কোনদিন সে গৃহে ফিরে আসেনি।

মুণ্ডিত মস্তক, পরণে গৈরিক বেশ হাতে দণ্ড আর কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি -- নিঃসঙ্গ বালক চলেছে নর্মদার দিকে। সেই যে এক সাপুড়ে দম্পতি তাকে বলে দিয়েছিল -- নর্মদার তীরেই তুমি তোমার অভীষ্ঠ গুরুর সন্ধান পাবে, তাই শুরু হয়েছে তার পথ পরিক্রমা।

রাত যায়, দিন আসে। অকুতাভয় অভিযাত্রী অতিক্রম করে যায় মাইলের পর মাইল, পেরিয়ে যায় দুর্ভেদ্য অরণ্য। পথের লোক অবাক হয়ে বালক ব্রহ্মচারীকে দ্যাখে, এগিয়ে এসে তারা প্রণাম করে আর ভাবে - কে এই জ্যোর্তিময় দেবশিশু। ঈশ্বর অন্বেষণে মায়ের কোল ছেড়ে পথে নেমেছে?

এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে পীতাম্বর এসে পৌঁছল 'নর্মদা মাতার নাভিস্থান' ঋদ্ধনাথে, যেখান থেকে শুরু হয় নর্মদা পরিক্রমা। শেষও হয় এখানে এসে।

বৈদিক ঋষিরা নর্মদার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে বলেছেন --

'নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রতেজাৎ বিনিঃসৃতা।

তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরানি চরানি চ।।'

অর্থাৎ নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হল রুদ্রে তেজ থেকে থেকে উৎপন্না নর্মদা, যিনি স্থাবর জঙ্গম সবকিছুই তিনি ত্রাণ করেন। এই নর্মদা পরিক্রমা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়,

কঠোরভাবে মেনে চলতে হয় এই দুঃসাধ্য পরিক্রমার নিয়মাবলী। ধ্যানানন্দ নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে বালক পীতাম্বর পরিক্রমার জন্য নিজেকে তৈরী করল। তারপর সাধু ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে পরিক্রমায় রত হল। একসময় তারা ভৃগুক্ষেত্রে সিদ্ধযোগী ভুরিয়াবাবার সাধন কুটীরে পৌঁছল। ভুরিয়া বাবা ছোট্ট ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং পীতাম্বরকে গঙ্গোনাথে যেতে বললেন -- 'গঙ্গোনাথেই তুমি তোমার গুরুর দর্শন পাবে।'

গঙ্গোনাথে মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দর্শন পেল পীতাম্বর। গুরুর বয়স তখন শতাধিক। বালক পীতাম্বরকে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিলেন। বালা ত্রিপুরার ভক্ত এবং নিতান্ত বালক বলে গুরু তার নামকরণ করলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী। উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮২৯ সালে আবির্ভূত বংশীলাল - নর্মদার ঘর পালানো এই ছেলেটি পরবর্ত্তীকালে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ হিসাবে বিখ্যাত হন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর আশ্রমে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধসাধক গৌরীশঙ্কর ব্রহ্মচারী যাঁর কাছ থেকে বালানন্দ শিক্ষা করেন নানা ধরণের যোগ এবং লাভ করেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান। নর্মদা পরিক্রমাকালে হঠযোগী মার্কণ্ডেয় মহারাজের কাছ থেকেও তিনি যোগ শিক্ষা করেন। দীর্ঘ বারো বছর পরে তাঁর নর্মদা পরিক্রমা শেষ হয়। এই সময়ের মধ্যেই তিনি উচ্চস্তরের সাধক হয়ে ওঠেন।

এরপর বহু বছর ধরে তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও ধর্মস্থান পরিভ্রমণ করে বেড়ান। ধীরে ধীরে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং প্রভূত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। লোকে তাঁকে 'সচল শিব' বলে নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাত। যোগ সাধনায় তাঁরা অসামান্য দক্ষতার কথা জানিয়েছেন তাঁরই শিষ্য শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী -- 'ষট্চক্রের বর্ণনা বা সাধনার কথা বহু গ্রন্থে আমরা দেখিয়া থাকি, কিন্তু প্রতিটি চক্রকে সাধনার দ্বারা উপলব্দি করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্তি করিয়াছেন, এইরূপ সাধক খুবই বিরল। কিন্তু গুরু মহারাজ নয় বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার পক্ষে ঐ কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। যোগমার্গের ব্যায়াম স্বরূপ যে প্রধান চতুরশীতি আসন নিরূপিত আছে তাহা তিনি অক্লেশে করিতেন। .... অনাহত নামক পদ্মে সমাহিত হইয়া তিনি প্রভূত যোগশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।' (যোগজ প্রজ্ঞা – 'শ্রীশ্রী তারানন্দ রচনা সম্ভার)। দেওঘর তপোবন পাহাড়ের সাধনগুহায় থাকাকালীন তাঁর অসাধারণ জ্যোতির্ময় মুর্তি এবং যোগ-বিভূতির কথা দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে করণীবাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেই অতিবাহিত হয় তাঁর জীবনের শেষ বত্রিশ বছর। ঐ সময়ে অগণিত মানুষ তার কৃপা লাভে ধন্য হয়। ১৯৩৭ সালের ৯ই জুন, একশো আট বছর বয়সে এই মহাযোগী ব্রহ্মলীন হন।

(২)

এক তপ্ত দ্বিপ্রহরে 'প্রেম মন্দিরে' প্রবেশ করল নাস্তিক ব্রাহ্মণ যুবক। সহকর্মীর মুখে সে শুনেছিল এখানে একজন বড় সাধু থাকেন। কেমন সাধু তাই সে দেখতে এসেছিল।

আশ্রমের একজন তাকে জানালেন যে মহারাজ তাঁর দোতলার ঘরে এখন বিশ্রাম করছেন। বিকেলের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

যুবকটি একটু হতাশ হল। তবু সে আশ্রমটা ঘুরে ঘুরে দেখল এবং এক সময়ে দোতলায় গিয়ে মহারাজের ঘরের সামনে বসে পড়ল।

মহারাজের বন্ধ দরজা ঐ সময়ে খোলে না। তবু খুলে গেল হঠাৎ। আর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন এক অনিন্দ্যকান্তি জ্যোতির্ময় বৃদ্ধ, মুখে দেব-দুর্লভ হাসি।

যুবক বুঝতে পারল, ইনিই সেই মহারাজ যাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে।

সহাস্য মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন, আর উদ্ধত, অহঙ্কারী, নাস্তিক যুবক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দরজার - ফ্রেমে আঁটা দেবতার মূর্তির দিয়ে চেয়ে আছে। ভাবছে -- কে ইনি? পৌরাণিক যুগের কোনো ঋষি? মানুষের শরীরে এত জ্যোতি? এত দিব্য কান্তি? এত রূপ?

উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে মহারাজকে প্রণাম করল। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে মহারাজ তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস আস্তে আস্তে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

যুবকটির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। সে বসে রইল চুপ চাপ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। তারপর রাত্রি নামল। তার আর বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মহারাজের সঙ্গে, বললেন -- কি গো, রাত হলো বাড়ি যাবে না?

-- হ্যাঁ, এবার যাবো। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে।

মহারাজকে সে প্রণাম করল। মহারাজ তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, -- আবার এসো।

মহারাজের ঋষিতুল্য প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব, তাঁর অপূর্ব হাসি আর তাঁর মধুর ব্যবহার মুহূর্তের মধ্যেই এক অবিশ্বাসীর মনের অন্ধকার দূর করে দিল। সে মনে মনে বলতে লাগল -- 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর'। এরপর সে ঘন ঘন মন্দিরে আসতে লাগল। মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর অবশেষে সে মহারাজেরই শিষ্য, বর্তমান আশ্রম-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল।

কোনো ধর্মোপদেশ না দিয়েও একজন নাস্তিককে এক পলকেই যিনি জন্মান্তর ঘটিয়ে দিলেন, তিনি হলেন প্রেম মন্দির আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধকপ্রবর শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রী শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী শৈলনন্দিনী দেবী একটি সুপুত্রের আশায় বাবা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেন। বাবার কৃপাতেই ১৯০১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩০৮ সনের ৬ই আশ্বিন) তারকদাস জন্মগ্রহণ করেন। বাবা তারকেশ্বরের কৃপায় জন্ম বলে পুত্রের নাম রাখা হয় তারকদাস।

শ্রীরামপুরে তাঁর জন্ম, শ্রীরামপুরে তাঁর শিক্ষা, তাঁর কৈশোরের ক্রীড়াভূমি আর শ্রীরামপুরের অনতিদূরেই ছিল তাঁর বার্ধক্যের বারানসী'। প্রথমে কলকাতায় এবং পরে বোম্বাই -এ কিছুদিন চাকরী করার পর মায়ের অনুমতি ছাড়াই তিনি যোগিরাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তারকদাস রূপান্তরিত হলেন তারানন্দ ব্রহ্মচারীরূপে।

'সচল শিব' শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর দক্ষিণহস্ত ও প্রথম ব্রহ্মচারী শিষ্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে লাগল তারানন্দজীর সাধক জীবন। তিনি যোগশিক্ষা ও নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। দেওঘর করণীবাদ আশ্রমে তিনি প্রায় চোদ্দ বছর যোগসাধনা করেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং অসুস্থ মা-কে সেবা শুশ্রূষার জন্য নর্মদা পরিক্রমা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন এবং রিষড়ার গঙ্গাতীরবর্তী এক সুন্দর পরিবেশে প্রেম মন্দির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৪০ সনের মাঘ মাসে।

আশ্রমে তারানন্দজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মন্দির নির্মিত হল। মন্দিরে কোন্ মূর্তি তিনি স্থাপন করবেন তার জন্য তিনি অন্তর্দেশ থেকে অন্তরতমের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী মাতার স্বপ্নাদেশ পেলেন -- 'তোর এই শরীরের জনক-জননীকে প্রতিষ্ঠা কর।' একই মূর্তিতে জনক-জননীর সমন্বয় একমাত্র অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিতেই সম্ভব। তাই শ্রীমহারাজ মন্দিরে ঐ মূর্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে এই সৌম্য সুন্দর যোগীর কাছে ভক্তরা আসতে আরম্ভ করেন। আপদে-বিপদে, সুখে দুঃখে, রোগে শোকে তাঁর চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। তিনিও অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাঁদের দেহমনের ক্লেদ দূর করে দিয়েছেন।

'গুপ্ত যোগী' তারানন্দজী ছিলেন প্রচার বিমুখ, স্বল্পবাক, অন্তর্মুখী এবং নিরহঙ্কার। নিজেকে জাহির করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। গুরু বালানন্দজীর শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর সর্বাঙ্গ সুলক্ষণযুক্ত চেহারা, দিব্যকান্তি এবং

দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবলে তাঁর অনুরাগীদের মনে পড়ে যায় উপনিষদের সেই মহান ঋষিকে, যিনি উচ্চারণ করেছিলেন সেই অবিস্মরণীয় মন্ত্র ঃ-

'শৃন্বন্তু বিশ্বে, অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।'

অর্থাৎ -- বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রেরা আর যাঁরা দিব্যধামেতে আছেন, শোনো। আমি অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে সেই আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষকে জেনেছি, কেবলমাত্র তাঁকে জেনেই মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়, আর অন্য কোনো পথ নেই।

তারানন্দজী যোগ-বিভূতিরও অধিকারী ছিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বহু মানুষকে তিনি দৈব ওষুধ ও যোগ বিভূতির সাহায্যে সুস্থ করে তুলেছেন। তাঁর এক শিষ্য লিখছেন -- 'কোন একটা ব্যাপারে অকস্মাৎ প্রাণনাশের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হই। ... বিপদাশঙ্কায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ আশ্রয় গুরুদেবও তখন সবেমাত্র দুর্গাপুর গেছেন। সেখানে বেশ কয়েকদিনের অবস্থানসূচী রয়েছে।' শিষ্য সবকিছু বিবৃত করে একজনকে দুর্গাপুরে তাঁর কাছে পাঠালেন। গুরুদেব সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করে পরের দিন ফিরে এলেন এবং সোজা তাঁর বাড়িতে শিষ্যের সঙ্গে দেখা করলেন। 'তারপর একান্তে আমাকে কিছু বিশেষ মন্ত্রজপ ও স্তোত্রপাঠ অতিরিক্তভাবে নিয়মিত করে যাবার জন্য এবং আরও একটি অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট কয়েকদিন যাবৎ করবার উপদেশ দিয়ে, নিরঙ্কুশ অভয় দান করে আশ্রমে ফিরে গেলেন। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সকালে এসে, অনুষ্ঠান কেমন চলছে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে গেলেন। .... তাঁর নির্দেশ পালন করে আমি অত্যাশ্চর্য ফল পেয়েছিলাম' (শ্রদ্ধাঞ্জলি -- প্রেম মন্দির প্রকাশন)। মহারাজের শিষ্য ভক্তরা এই ধরণের বহু ঘটনার সাক্ষী।

তারানন্দজী দিব্য মানব হয়েও মাটির পৃথিবীকে কখনও বিস্মৃত হননি। অভিজাত -অ পজাত, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন -- সকলের সঙ্গেই তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক। সকলের কাছেই তিনি ছিলেন সর্বদুঃখহর, সর্বতাপহর এক স্থির নিশ্চিত আশ্রয়।

তারানন্দ মহারাজ ছিলেন ভারতীয় শাস্ত্র পুরাণের বিশ্বকোষ-স্বরূপ। সীমাহীন ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য। অনেক ধর্মীয় প্রবন্ধ ও কবিতা তিনি রচনা করেছেন যা সঙ্কলিত হয়েছে তাঁর রচনা সম্ভারে। এগুলির ধর্মীয় ও সাহিত্য মূল্য অপরিসীম।

জগৎমাতা ছিলেন সাধকপ্রবরের আরাধ্য। কিন্তু নিজ গর্ভধারিনীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রেম মন্দিরের

তিনি স্থাপন করেছেন মাতৃমন্দির, যেখানে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তিনি প্রতিদিন মাতৃপূজা করতেন।

১৯৩১ ২৬শে চৈত্র গভীর রাতে (ইং ১০ই এপ্রিল) এই ব্রহ্মবিদ পরমপুরুষ নার্সিং হোমে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। মহারাজের শিষ্য-ভক্তদের বিশ্বাস -- দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটলেও তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। ভক্তদের হৃদয় সিংহাসনে আজও তাঁর অক্ষয় আসন। সেখানেই চলে তাঁর নিত্য পূজা, নিত্য আরতি।

(৩)

রিষড়ার 'প্রেম মন্দির' আশ্রমে শ্রীশ্রী অর্ধনারীশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা তিথি উপলক্ষে সকালবেলায় অনুষ্ঠিত (১৯.১.৩১) এক ঘরোয়া আলোচনাসভায় তৎকালীন আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন -- 'একটি শুদ্ধসত্ত্ব ভালো ছেলে খুঁজছিলুম। গুরুর কৃপায় পেয়েও গেলুম। নাম শ্রী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোলানাথ! একেবারে শিব!' মহারাজের মুখে মৃদু হাসি, বললেন, 'দেখলুম তার চেহারা — পাক্‌কা সাহেব!'

মহারাজের কথায় শ্রোতারা হেসে উঠলেন। কেননা মহারাজের ঐ 'পাক্‌কা সাহেব' আদৌ গৌরবর্ণ নন।

মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, গায়ের রং কালো, কিন্তু তাতে কি এসে যায়? হীরের টুকরো ছেলে।' মহারাজ নিজের শরীরকে ইঙ্গিত করে বললেন -- 'এই শরীরটা যদি কোনো তপস্যা করে থাকে, গুরুদেবের আশীর্বাদে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে থাকে -- তার ফলেই এমন শিষ্যকে পেয়েছে।'

শুধু ঘরোয়া আলোচনায় নয়, বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীর কাছেও বৃদ্ধ মহারাজ তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। যেন এক অমূল্য সম্পদ তিনি আবিষ্কার করেছেন, আর এই আবিষ্কারের আনন্দ তিনি কিছুতেই গোপন করতে পারছেন না। দণ্ডিস্বামী শুদ্ধবোধাশ্রম মহারাজ আশ্রমে এসেছেন। অতিথিপরায়ণ মহারাজ তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সহাস্যে বললেন, --'জানো, এক চমৎকার শিষ্য পেয়েছি। কি নাম দিয়েছি শুনবে? দেবানন্দ। সত্যি, দেবতার আনন্দের মতো জিনিস!' শুদ্ধবোধাশ্রম মহারাজ শিষ্যটির সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তারানন্দজীর কথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়।

কে এই শিষ্য যাঁর সম্বন্ধে এক সিদ্ধযোগীর এত স্নেহ, এত ভালোবাসা, এত প্রশংসা?

শিষ্যটি বর্তমান প্রেম মন্দির আশ্রমের 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা' এবং অধ্যক্ষ, শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীর সার্থক উত্তরসূরি শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

হাওড়ার শিবপুরে ১৯৪০ সালের ২৪শে অক্টোবরে (বাংলা ৭ই কার্তিক ১৩৪৪ সন), বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা নবমী তিথিতে শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতা শ্রী সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যশস্বী শিক্ষক (পরে অবশ্য তিনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন)। মাতা শ্রীমতী তারা দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা। তাঁদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন এবং কনিষ্ঠ ভোলানাথ। শ্রী সুবোধকুমারের এক কাকা, অর্থাৎ ভোলানাথের এক দাদু ছিলেন কাশীর কামরূপ মঠের সন্ন্যাসী। তাঁর নাম ছিল দণ্ডিস্বামী বাসুদেব তীর্থ।

ভোলানাথ বি কে পাল ইন্সটিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। অসাধারণ তাঁর মেধা, স্মরণশক্তি ও একাগ্রতা। পরীক্ষা-বৈতরণী, তা সে যতই দুরতিক্রম্য হোক না কেন, হাসতে হাসতে পার হয়ে যেতেন। বিজ্ঞান পড়তে ভালোবাসলেও মহাপুরুষের জীবনী, ইতিহাস এবং ধর্মসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থপাঠেও তাঁর ছিল অসীম উৎসাহ। আসলে, যাঁরাই সত্যসন্ধানী, শিব-সুন্দরের পূজারী, তাঁদের প্রতিই ছাত্র ভোলানাথের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। আবাল্য তিনি ছিলেন নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, পরদুঃখকাতর এবং নিরহঙ্কার। এক কথায়, একজন আদর্শ ছাত্রের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, সেগুলির প্রত্যেকটি ছিল তাঁর মধ্যে। তাই নিজ গুণেই তিনি আদায় করে নিতেন শিক্ষক ও গুরুজনদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা।

ছেলেবেলায় ভোলানাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁর বয়সী অনেক ছেলেরই থাকে না। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁর কিরকম একটা ভাবান্তর হত। হাঁ করে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁদের কাছে বসতেন, হয়তো বা কিছু বাক্যালাপও করতেন। অবসর সময়ে কিংবা ছুটির দিনে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর বা কোনো ধর্মস্থানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন পূজারীর পূজা পদ্ধতি। দেবদেবীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তন্ময় হয়ে যেতেন। শুদ্ধাচারী, ভক্তি-বিনম্র তরুণের চোখে মৃন্ময় দেবদেবীরা চিন্ময় হয়ে উঠতেন। যেখানে ধর্মকথা হতো, সেখানে বসে যেতেন চুপটি করে। ভগবৎ প্রসঙ্গ আর শাস্ত্র কথা তাঁর কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে গিয়ে প্রবেশ করত, আর তিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। এইভাবে, ছাত্রজীবনেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ সাধক জীবনের ভিত্তিভূমি।

একদিন ভোলানাথের জীবনে এল এক মাহেন্দ্রক্ষণ। তখন তিনি কলেজের ছাত্র। তাঁর এক প্রতিবেশী এবং শুভানুধ্যায়ী শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রী ত্রিদিবানন্দ ব্রহ্মচারী) একদিন তাঁকে বললেন - 'ভোলানাথ, তুমি তো অনেক মঠে মন্দিরে যাও, একদিন রিষড়ায় আমার গুরুদেবের আশ্রমে যাবে?'

এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন ভোলানাথ। কলেজ কামাই করে একদিন সুব্রতর সঙ্গে চলে গেলেন প্রেম মন্দিরে।

প্রতিটি প্রথম দর্শনার্থীর মতো ভোলানাথও অবাক হয়ে গেলেন, তাঁরই ভাষায়, 'কপালে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় ছোট দানার রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে অরুণবর্ণ বসন' জ্যোতির্ময় প্রৌঢ় সাধু শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজকে দেখে। তাঁর মনে হল, 'প্রাচীন ভারতের তপোবনের কোন প্রজ্ঞাবান ঋষি, অনুভব করলাম এক স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপুঞ্জ তাঁর সমগ্র দেবদুর্লভ অবয়বটিকে ঘিরে রয়েছে।' মুখে সেই হৃদয়-জয় করা হাসি। প্রণাম করতে ভুলে গিয়ে ভোলানাথ অপলক দৃষ্টিতে 'মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি, উন্নত দর্শন' মহারাজকে কেবল দেখে যাচ্ছেন।

হঠাৎ সুব্রতকে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছেলেটিকে কোথা থেকে নিয়ে এলে হে?' বলেই তিনি কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। অতীতচারী হয়ে উঠল তাঁর মন। তারপর মধুর স্বরে বললেন, 'জানো, আমি যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে যাই, সেদিন আমাকে দেখেই তিনি সস্নেহে বলেছিলেন, 'আয়া?' মানে 'এসেছো?' তারপর ভোলানাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমাকে দেখেই আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল।'

কত দর্শনার্থী তো প্রতিদিন মহারাজের কাছে আসেন। আর কাউকে দেখে কি তাঁর মনে পড়েছে ভাবী গুরু বালানন্দজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা? সর্বজ্ঞ শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী বুঝতে পেরেছিলেন, একদিন এই শুদ্ধসত্ত্ব তরুণই হবেন তাঁর সার্থক উত্তরসাধক।

ভোলানাথ প্রণাম করলেন। সস্নেহে আর্শীর্বাদ করে মহারাজ বললেন -- 'মাঝে মাঝে এখানে আসবে।'

মাঝে মাঝে! ভোলানাথের মনে হয়েছিল 'জীবন ধন্য হয়ে যাবে যদি অনুক্ষণ এই ক্ষণজন্মা তপোমূর্তির নিত্য সান্নিধ্য পেতাম।' পরবর্ত্তীকালে তিনি লেখেন -- 'সেদিন নীরব সম্মতি জানিয়ে গৃহে ফিরে আসি। কিন্তু সকল কাজের মাঝে তাঁর স্নেহ-মমতা মাখানো আলোকোজ্জ্বল মুখখানি বার বার মনে পড়তে থাকে।' মন যেন গেয়ে ওঠে।

'তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম দাও।
তব মধুময় প্রেমরসসুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী আনন্দ জাগাও।।'

— রবীন্দ্রনাথ

এরপর সুযোগ এবং সময় পেলেই ভোলানাথ চলে যেতেন প্রেম মন্দিরে। দেখতেন ভক্ত-পরিবৃত মহারাজ ধর্মকথা আলোচনা করছেন। ভোলানাথকে দেখেই

মহারাজ ভক্ত সঙ্গ ছেড়ে চলে আসতেন। তাঁকে নিয়ে যেতেন নির্জনে, পাতাল ঘরের ছাদে। ভাবী শিষ্যকে সাধনপথের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। তারপর মিশে যেতেন ভক্তসঙ্গে। ভোলানাথ যখনই আশ্রমে যেতেন, তখনই মহারাজ তাঁকে একান্তে ডেকে নিতেন এবং তাঁর শিক্ষায় ভাবী শিষ্যকে শিক্ষিত করে তুলতেন। ভাবী শিষ্যের কতটা উন্নতি হয়েছে, অবনতি হয়েছে কিনা -- সব খবর মহারাজকে দিতে হত। তখনও ভোলানাথ কলেজের ছাত্র এবং অদীক্ষিত। মহারাজ নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর 'সাধনার কুসুমটিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার' গ্রহণ করেছিলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না।

এম এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভোলানাথ বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে (ইটাচুনা কলেজ) অধ্যাপনা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। প্রয়োজনে চাকরী করতে হত বটে কিন্তু মন পড়ে থাকত প্রেম মন্দিরের প্রেমময় ব্রহ্মচারীর দিকে। এই ভাবে ছ'বছর মহারাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার পর ভোলানাথ ১৯৩১ সালে ভীম একাদশী তিথিতে (সাতাশে মাঘ, ১৩৪৭) শক্তিমন্ত্রে (কালী) দীক্ষিত হন এবং ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন। মহারাজ তার নাম দেন - শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

দীক্ষা দেবার অব্যবহিত পরেই ঘটল এক বিচিত্র ব্যাপার। মহারাজ দেবানন্দজীকে বললেন -- 'এখন কোথায় থাকবে?'

শিষ্য বললেন -- 'আপনি যেমন আদেশ করবেন মহারাজ।'

গুরু মহারাজ বললেন -- 'এখান থেকে তবে অন্যত্র চলে যাও।'

যিনি মূর্তিমান প্রেম, যাঁর প্রতিটি বাক্য মধুময়, তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন একটু কড়া বলে মনে হল।

-- 'চলে যাও।' মহারাজের চিত্তে কৃপা, ব্যবহারে কঠোরতা।

তরুণ ব্রহ্মচারীর বিস্ময় -- 'কোথায় যাব?'

--'যেখানে ইচ্ছা।'

প্রস্থান করলেন মহারাজ। বন্ধ হয়ে গেল আশ্রমের দরজা।

চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন, বাড়ি ফেরার পথও বন্ধ। এখন কোথায় যাবেন তরুণ ব্রহ্মচারী? কি খাবেন? কোথায় থাকবেন?

মহারাজ যে শিষ্যের তিতিক্ষা, সহ্যশক্তি ও বৈরাগ্য পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে চলে যেতে বলেছেন, দেবানন্দজী তখন তা বুঝতে পারেন নি।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে পথে নামলেন। দিনের পর দিন চললো ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও মাধুকরী। কোনদিন অন্ন জোটে, কোনদিন জোটে না। রাত্রি যাপন করেছেন

পথে-ঘাটে, মঠ-মন্দিরে। ঘুরে বেরিয়েছেন বাংলায়, বিহারে, উত্তরপ্রদেশের গ্রামে গঞ্জে।

একদিন ট্রেনে করে যাচ্ছেন। টিকিট না থাকায় চেকার মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত স্টেশন ভূষাওয়ালে দেবানন্দজীকে নামিয়ে দিলেন। নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনও বিকল হয়ে গেল।

যে কামরায় দেবানন্দজী ছিলেন, সেই কামরার লোকজনও স্টেশনে নেমে পড়ল এবং চেকারকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলতে লাগল -- ' এই সাধুবাবাকে জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছো। তাই ট্রেন চলছে না। এঁকে ট্রেনে তুলে নাও।' স্টেশনের অন্য যাত্রীরাও দেবানন্দজীর পক্ষ নিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

কিন্তু চেকারবাবুটি নিজ সিদ্ধান্তে অটল, অনড়। এদিকে ট্রেনও দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন থেমে থাকলে যাত্রীদের অসুবিধা হতে পারে। দেবানন্দজী তাই 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে হাত নাড়লেন। ট্রেনটা যেন তাঁরই সিদ্ধান্ত ও ইসারার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি হাত নাড়তেই ট্রেন চলতে শুরু করল।

দেবানন্দজী ভূষাওয়ালের এক গ্রামে প্রবেশ করলেন। অখ্যাত, অজ্ঞাত জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি এসে পৌঁছলেন ছোট্ট এক হনুমানজীর মন্দিরে। নির্জন মন্দির, কেবল এক বয়স্ক সাধু মন্দিরের সামনে এক দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। তার বিপরীত দিকে আর একটি দাওয়ায় শুয়ে পড়লেন দেবানন্দজী। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

-- 'বাবাজী, বাবাজী --'

ঘুম ভেঙে গেল এক মহিলার কণ্ঠস্বরে। উঠে বসে দেখলেন এক অবাঙালী সধবা মহিলা খাবার নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হিন্দী ভাষায় তিনি যা বললেন তার অর্থ হল -- 'বাবাজী, দু'দিন তো কিচ্ছু খাওনি। একটা কলা খেয়ে আছো না? নাও, এই চাপাটি, হালুয়া আর দুধটুকু খেয়ে নাও।'

দেবানন্দজী তাঁর হাত থেকে খাবার নিলেন। মহিলা তাঁকে খাইয়ে প্রস্থান করলেন।

দেবানন্দজী তৃপ্তি করে খেলেন এবং আবার শুয়ে পড়লেন। পরে দাওয়ায় যে বয়স্ক সাধু ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হতে তিনি ব্যাপারটা জানালেন।

সাধুবাবা শুনে অবাক! অনেকদিন তিনি ঐ মন্দিরে রয়েছেন, কিন্তু কেউ কোনোদিন তাঁকে খাবার দিয়ে যায়নি। তাছাড়া ঐ গ্রামে গরীব মানুষের বাস। কে এখানে সাধুসন্ন্যাসীকে খাওয়াবে?

দেবানন্দজী বুঝতে পারলেন মহিলার রূপ ধরে তাঁর পরম করুণাময়ী ইষ্টদেবী তাঁকে খাবার দিয়ে গেছেন

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো -- মহামায়ার কৃপা তিনি বেশ কয়েকবারই পেয়েছেন। কিন্তু সেসব কথা তিনি বলতে চান না। ২৮.৮.১৯৩১ তারিখে, শিষ্যা শ্রীমতী কাবেরী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন দুটি ঘটনার কথা উদ্‌ঘাটিত করেন যা গুরুদেব শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কাউকে তিনি কখনও জানাননি।

প্রেম মন্দির আশ্রমে থাকাকালীন একবার শ্রী দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মারাত্মক বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। গুরুমহারাজ মাতৃস্নেহে তাঁর শুশ্রূষা করতেন। শিষ্যের মাথার শিয়রে তিনি শীতলা মাতার উদ্দেশে একটি ঘট স্থাপন করে নিত্য ধূপ ধূনা দিতেন। শিষ্যের আরোগ্য কামনায় প্রতিদিন তার ওপর বারোটা তুলসী পাতা উৎসর্গ করতেন নারায়ণকে।

একদিন দেবানন্দজীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কা জনক হয়ে উঠল। শরীর বড় বড় গুটিতে ভরে গেছে। তার ওপর প্রচণ্ড জ্বর আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। কেউ কেউ ভাবলেন রাত বুঝি আর কাটবে না। অচিরেই তিনি বোধহয় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকগমন করবেন।

গুরু মহারাজ শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে রাত দশটা নাগাদ শুতে চলে গেলেন।

হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘোড়া ছুটিয়ে এলে যেমন একটা হাওয়া ওঠে, সেইরকম একটা ঝোড়ো হাওয়া সশব্দে ও প্রবল বেগে দেবাননন্দজীর জানলা দিয়ে ঢুকে তাঁর মাথা পর্যন্ত এসে আবার জানলা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করলেন তাঁর আর কোনো কষ্ট নেই, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

পরের দিন গুরু মহারাজকে ব্যাপারটা জানাতে তিনি বললেন, 'মা শীতলা এসেছিলেন। তিনি এসে তোমাকে ভালো করে দিয়ে গেছেন।'

আর একটি ঘটনা।

মহারাজ একদিন কোনো কাজে দেবানন্দজীকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। সারাদিন ঘুরে খুব ক্লান্ত হয়ে রাত্রিবেলা তিনি আশ্রমে ফিরলেন। মাতৃ মন্দিরের কাছে ছোট্ট ঘরে বিছানায় শুয়ে ইষ্টদেবীকে স্মরণ করছেন আর ভাবছেন যদি তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দেন তাহলে তাঁর আর কোনো ক্লান্তি থাকবে না। চোখ বুজে শুয়ে তিনি এসব কথাই ভাবছেন।

হঠাৎ কপালে পেলেন কোমল হাতের অপূর্ব স্নেহস্পর্শ। আঃ! কি অনাবিল শান্তি! কি স্বস্তি! তবে কি সত্যিই মা এসেছেন? দেবানন্দজী ভাবছেন, একবার চোখখুলে দেখলে হয়না!

মাতৃরূপ অবলোকনের জন্য তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন এক অভাবিত দৃশ্য।

মহাদেবী দ্রুত চলে যাচ্ছেন, আর তাঁর পেছনে গঙ্গার দিকে ছুটে চলেছে চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যা!

আনন্দে, বিস্ময়ে প্রথমে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর তীব্র অন্তর্দহনে অস্থির হয়ে গেলেন। হায়! কেন তিনি চোখ খুললেন! চোখ বুজে থাকলে আরও কিছুক্ষণ মা থাকতেন এবং তাঁর স্নেহস্পর্শ পেতেন! আকুল হয়ে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কান্না শুনে মহারাজ তাঁর ঘর থেকে ছুটে গেলেন।

-- 'কি ব্যাপার দেবানন্দ? কি হয়েছে? এত কাঁদছো কেন?'

মহারাজকে দেখে দেবানন্দজী আত্ম সম্বরণ করে তাঁর অদ্ভুত দর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। স্থিতধী, স্বল্পবাক গুরুমহারাজ চুপ করে শুনলেন শিষ্যের কথা। তারপর শান্ত গলায় বললেন -- ' ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরকম দর্শন ও অনুভূতি অস্বাভাবিক নয়। এখন ঘুমোও।'

এক বছর পরে, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ফিরে এলেন প্রেমমন্দিরে, প্রেমস্নিগ্ধ গুরু মহারাজের স্নেহ নীড়ে। মহারাজ সাগ্রহে তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর উত্তর সূরি হিসাবে শিষ্যকে তৈরী করতে লাগলেন।

মহারাজের শিক্ষায় সদা হাস্যময় ব্রহ্মচারী সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন, বুৎপত্তি অর্জন করলেন বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণে, পূজা-পাঠ এবং সাধন ক্রিয়ায়। অল্প দিনের মধ্যেই সুসংগঠক, সুলেখক, সুবক্তা এবং সর্বকর্মনিপুণ ব্রহ্মচারী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

১৯৩১ সালে গুরুদেব শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ হন দেবানন্দজী। বর্তমানে তিনিই শিষ্য ভক্তদের কাছে মহারাজ। ছোট্ট প্রেমমন্দির তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ভক্তদের আন্তরিক সহায়তায় অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং শিষ্য ভক্তের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী সুলেখক। ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত। 'শ্রীশ্রী অর্দ্ধনারীশ্বর -- তত্ত্ব ও তথ্য', 'যোগসাধনা' প্রভৃতি গবেষণাধর্মী পুস্তিকা তাঁর জ্ঞান ও মনস্বিতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। প্রেম মন্দির প্রকাশন বিভাগ, 'প্রেম প্রবাহ' পত্রিকা, সংস্কৃত শিক্ষণ বিভাগ, দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, যোগ ব্যায়াম শিক্ষণ বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন তাঁরই উপদেশ ও পরিচালনায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে।

সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর মধুর ব্যবহার। 'হসিতং মধুরং', 'হৃদয়ং মধুরং, 'বচনং মধুরং, 'চরিতং মধুরং' -- তাঁর হাস্য মধুর, হৃদয় মধুর, বচন মধুর এবং চরিত্র মধুর। তাঁর সবই মধুর। তিনি মধুনিষ্যন্দী।